সূচীপত্র

সাপ্তাহিক
আরাফাত
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

www.weeklyarafat.com

৬৭ বর্ষ | সংখ্যা: ০৫-০৬
১০ নভেম্বর ২০২৫ সোমবার

উপমহাদেশের প্রথম মসজিদ
চেরামন জুমা মসজিদ, কেরালা, ভারত

সূচীপত্র

সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠাকাল- ১৯৫৭

আরাফাত

মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক

রেজি - ডি.এ. ৬০

প্রতিষ্ঠাতা : আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)
সম্পাদকমন্ডলীর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি : প্রফেসর ড. মুহাম্মদ আব্দুল বারী (রহ)

مجلة عرفات الأسبوعية

تصدر من المكتب الرئيسي لجمعية أهل الحديث ببنغلاديش
٩٨. نواب فور، داكا–١١٠٠
الهاتف: ٠٢٧٥٤٢٤٣٤، الجوال: ٠٩٣٣٣٥٥٩٠١
المؤسس: العلامة محمد عبد الله الكافي القريشي (رحمه الله تعالى)
الرئيس المؤسس لمجلس الإدارة
الفقيد العلامة د. محمد عبد الباري (رحمه الله تعالى)
الرئيس الحالي لمجلس الإدارة:
الأستاذ الدكتور عبد الله فاروق (حفظه الله تعال)
رئيس التحرير:الأستاذ/محمد أسد الإسلام

গ্রাহক ও এজেন্ট হওয়ার নিয়মাবলী

বছরের যে কোনো সময় গ্রাহক হওয়া যায়। ছয় মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। জামানত বাবদ প্রতি সংখ্যার জন্য অগ্রিম ১০০/- (একশত) টাকা পাঠিয়ে বছরের যে কোনো সময় এজেন্সি নেওয়া যায়। ১০ কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। ১০-২৪ কপি পর্যন্ত ২০%, ২৬-৭০ কপির জন্য ২৫% এবং ৭০ কপির উর্দ্ধে ৩০% কমিশন দেওয়া হয়। প্রত্যেক এজেন্টকে প্রতি ২৫ কপির জন্য ১ কপি, ৫০ কপির জন্য ২ কপি এবং ৭৫ কপির জন্য ৩ কপি করে সৌজন্য সংখ্যা দেওয়া হয়। জামানতের টাকা পত্রিকা অফিসে নগদ / বিকাশ বা সাপ্তাহিক আরাফাতের নিজস্ব একাউন্ট নম্বরে জমা দিয়ে এজেন্ট হওয়া যায়।

ব্যাংক একাউন্টসমূহ

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি
নওয়াবপুর রোড শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১১৮০২০০২৮৫৬০০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০১

বিকাশ নম্বর

০১৯৩৩৩৫৫৯০৫
চার্জসহ বিকাশ নম্বরে টাকা প্রেরণ করে
উক্ত নম্বরে ফোন করে নিশ্চিত হোন।

সাপ্তাহিক আরাফাত

ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি, বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-২০৫০১৭৯০২০১৩৩৫৯০৭
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯১০

মাসিক তর্জুমানুল হাদীস

শাহজালাল ইসলামী ব্যাংক পিএলসি
বংশাল শাখা
সঞ্চয়ী হিসাব নম্বর-৪০০৯১৩১০০০০১৪৪০
যোগাযোগ : ০১৯৩৩৩৫৫৯০৮

নভেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী সালের সালাতের সময়সূচি (ঢাকার জন্য)

তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা	তারিখ	ফজর	যোহর	'আসর	মাগরিব	'ইশা
০১.১১.২৫	০৪:৪৮	১১:৪২	০২:৫৬	০৫:২০	০৬:৩৬	১৬.১১.২৫	০৪:৫৬	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
০২.১১.২৫	০৪:৪৯	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৬	১৭.১১.২৫	০৪:৫৭	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১
০৩.১১.২৫	০৪:৪৯	১১:৪২	০২:৫৫	০৫:১৯	০৬:৩৫	১৮.১১.২৫	০৪:৫৭	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
০৪.১১.২৫	০৪:৫০	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৮	০৬:৩৫	১৯.১১.২৫	০৪:৫৮	১১:৪৪	০২:৫১	০৫:১২	০৬:৩১
০৫.১১.২৫	০৪:৫০	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪	২০.১১.২৫	০৪:৫৮	১১:৪৪	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
০৬.১১.২৫	০৪:৫১	১১:৪২	০২:৫৪	০৫:১৭	০৬:৩৪	২১.১১.২৫	০৪:৫৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩১
০৭.১১.২৫	০৪:৫১	১১:৪২	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৪	২২.১১.২৫	০৪:৫৯	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১২	০৬:৩০
০৮.১১.২৫	০৪:৫২	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩	২৩.১১.২৫	০৫:০০	১১:৪৫	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
০৯.১১.২৫	০৪:৫২	১১:৪৩	০২:৫৩	০৫:১৬	০৬:৩৩	২৪.১১.২৫	০৫:০১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১০.১১.২৫	০৪:৫৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩৩	২৫.১১.২৫	০৫:০১	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১১.১১.২৫	০৪:৫৩	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৫	০৬:৩২	২৬.১১.২৫	০৫:০২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩০
১২.১১.২৫	০৪:৫৪	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২	২৭.১১.২৫	০৫:০২	১১:৪৬	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৩.১১.২৫	০৪:৫৪	১১:৪৩	০২:৫২	০৫:১৪	০৬:৩২	২৮.১১.২৫	০৫:০৩	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৪.১১.২৫	০৪:৫৫	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৪	০৬:৩২	২৯.১১.২৫	০৫:০৪	১১:৪৭	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১
১৫.১১.২৫	০৪:৫৬	১১:৪৩	০২:৫১	০৫:১৩	০৬:৩১	৩০.১১.২৫	০৫:০৪	১১:৪৮	০২:৫০	০৫:১১	০৬:৩১

ঢাকার সময়ের আগে	সময়	ঢাকার সময়ের পরে
নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, পিরোজপুর	১ মিনিট	গাজীপুর, খুলনা, গোপালগঞ্জ
চাঁদপুর, বরিশাল, বি.বাড়িয়া	২ মিনিট	ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, মানিকগঞ্জ
সিলেট, হবিগঞ্জ	৩ মিনিট	টাংগাইল, সাতক্ষীরা
কুমিল্লা, মৌলভী বাজার	৪ মিনিট	যশোর, সিরাজগঞ্জ, রাজবাড়ী, শেরপুর, জামালপুর, ঝিনাইদহ
নোয়াখালী	৫ মিনিট	পাবনা, কুষ্টিয়া
ফেনী	৬ মিনিট	বগুড়া * ১০ মিনিটি পরে : চাঁপাইনবাবগঞ্জ, সৈয়দপুর
	৭ মিনিট	গাইবান্ধা, নাটোর, মেহেরপুর, কুড়িগ্রাম
	৮ মিনিট	নওগাঁ, রাজশাহী * ১৩ মিনিট পরে : ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়
চট্টগ্রাম	৯ মিনিট	জয়পুরহাট, রংপুর, লালমনিরহাট
কক্সবাজার	১১ মিনিট	দিনাজপুর, নীলফামারী

সূর্যাস্তের সময় অনুসারে ঢাকার সময়ের সাথে কিশোরগঞ্জ ও বাগেরহাট

সূচীপত্র

The weekly Arafat
সাপ্তাহিক
আরাফাত
عرفات الأسبوعية
شعار التضامن الإسلامي
মুসলিম সংহতির আহ্বায়ক
ধর্ম-দর্শন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য বিষয়ক সাপ্তাহিকী

প্রতিষ্ঠাকাল: ১৯৫৭
রেজি. ডি.এ. ৬০
বর্ষ ৬৭
সোমবার

১০ নভেম্বর ২০২৫ ঈসায়ী
২৫ কার্তিক ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
১৮ জমাদিউল আউয়াল ১৪৪৭ হিজরি
প্রকাশ মহল - ৯৮, নবাবপুর রোড, ঢাকা-১১০০

প্রতিষ্ঠাতা: আল্লামা মোহাম্মদ আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কোরায়শী (রহ)

সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি
অধ্যাপক ড. আব্দুল্লাহ ফারুক

উপদেষ্টামণ্ডলী
প্রফেসর এ. কে. এম শামসুল আলম
প্রফেসর ড. দেওয়ান আব্দুর রহীম
আলহাজ্জ মুহাম্মদ আওলাদ হোসেন
মুহাম্মদ রুহুল আমীন (সাবেক আইজিপি)
প্রফেসর ড. আ. ব. ম সাইফুল ইসলাম সিদ্দিকী
অধ্যক্ষ গোলাম কিবরিয়া নূরী
অধ্যাপক আহমদ আলী

সম্পাদক
অধ্যাপক মুহাম্মদ আসাদুল ইসলাম

নির্বাহী সম্পাদক
মুহাম্মদ গোলাম রহমান

সহকারী সম্পাদক
শাইখ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস সামাদ

প্রবাস সম্পাদক
মুহাম্মাদ রফিকুল ইসলাম মাদানী
হাফেয ড. সোহেল আহমাদ মাদানী

সম্পাদনা পরিষদ
প্রফেসর ড. মো. ওসমান গনী
প্রফেসর ড. ইফতিখারুল আলম মাসউদ
ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান মাদানী
ড. ইবরাহীম বিন আব্দুল হালীম মাদানী
মুহা. আব্দুল্লাহ আল-ফারুক
শাইখ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক

ব্যবস্থাপক : রবিউল ইসলাম
বিপণন কর্মকর্তা : মুহাম্মদ আব্দুল মুমিন
প্রচ্ছদ ও অঙ্গসজ্জা
মো: আনোয়ার হোসাইন ও নূর ইসলাম

সূচিপত্র

✍ সম্পাদকীয় ০২
◈ আল কুরআনুল হাকীম : ❖ মৃত্যুর অনুভূতি : এক ভয়ংকর বাস্তবতা!
✍ আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ- ০৩
◈ হাদীসে রাসূল ﷺ : ❖ দীনের উপর অবিচল থাকার অপরিহার্যতা
✍ আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক- ১০
◈ প্রবন্ধ : ❖ প্রসঙ্গ : বৈধ উপার্জন ✍ আবূ সা'দ ড. মো. ওসমান গনী- ১৩
❖ নববী দু'আ : এক অনন্য সৌভাগ্যের পরশ
✍ মো.খশিউর রহমান বিন মো.মনসুর আলী- ১৫
❖ মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ✍ মুহাম্মদ সাকিব- ১৮
❖ মৃতের গোসল এবং কাফনের কাপড় ✍ জান্নাতুল মহল- ২১
◈ ক্বাসাসুল কুরআন : ❖ জুলকারনাইন ও তার নির্মিত দেয়াল
✍ আবু তাহসীন মুহাম্মদ- ২৪
◈ বিশেষ মাসায়িল : ❖ ইসলাম কি কুশপুত্তলিকা দাহ সমর্থন করে?
✍ আরাফাত ডেস্ক- ২৫
◈ সাময়িক প্রসঙ্গ : ❖ প্রচলিত ওয়াজ মাহফিল ও সমাজের বাস্তবতা
✍ মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম- ২৬
◈ বিজ্ঞান-বিস্ময় : ❖ বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ৬টি চমক ✍ আরাফাত ডেস্ক- ২৯
◈ আত্মগঠন : ❖ বক্তব্য উপস্থাপনের যুগোপযোগী ও আধুনিক পদ্ধতি
✍ শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ- ৩২
❖ ... রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীলতা ও উত্তম চরিত্র
✍ মো. মনিরুজ্জামান- ৩৪
◈ নিভৃত ভাবনা : ❖ বই পড়ার কৌশল মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত বিশ্লেষণ
✍ আহমাদ বিন আব্দুস সালাম- ৩৭
◈ ইতিহাস-ঐতিহ্য : ❖ সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স : মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণের নায়ক
✍ নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ- ৪১
◈ পরামর্শ/সতর্কতা : ❖ শৈশবের ভারী ব্যাগ ✍ আব্দুল্লাহ আল নুমান- ৪২
❖ কবিতা ৪৫
❖ শুব্বান সংবাদ ৪৬
❖ স্বাস্থ্য-সচেতনতা : ❖ শীতের সূচনা : সকল বয়সীদের সচেতনতা জরুরি
✍ আরাফাত ডেস্ক- ৪৭
❖ প্রচ্ছদ রচনা ৪৮

যোগাযোগ
জমঈয়ত ভবন, ৭৯/ক/৩, উত্তর যাত্রাবাড়ি, ঢাকা-১২০৪।
নির্বাহী সম্পাদক: ০১৭১৬-৯০৬৪৮৭ ব্যবস্থাপক: ০১৯৩৩৩৫৫৯০১
বিপণন: ০১৯৩৩৩৫৫৯১০, কম্পিউটার বিভাগ: ০১৯৩৩৩৫৫৯০৭
টেলিফোন: +৮৮ ০২ ২২৪৪৫৮৫৫১ weeklyarafat@gmail.com
www.weeklyarafat.com, www.jamiyat.org.bd.com
Page: f/shaptahikArafat, f/groups/weeklyarafat

গ্রাহক চাঁদার হার (ডাকমাশুলসহ) বাংলাদেশ : (বার্ষিক : ৭০০/- ষান্মাসিক : ৩৫০/-) মূল্য : ২৫/- (পঁচিশ) টাকা মাত্র।

সূচীপত্র

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সম্পাদকীয়

নিবেদিত দা'ওয়াহ আমাদের পরিচয়, আমাদের অঙ্গীকার

দা'ওয়াহ শুধু কোনো দায়িত্ব নয়। এটি নবুওয়াতের উত্তরাধিকার, মানবতার আলোকবর্তিকা এবং চিরন্তন কল্যাণের এক অবিরাম আহ্বান। এ কাজ কোনো স্থান-কাল-পাত্র বা প্রজন্মের সীমানায় আবদ্ধ নয়; বরং এটি আদ্যন্ত চলমান এক ধারাবাহিক কর্মযজ্ঞ, যা নবী-রাসূল (ﷺ)-এর ত্যাগ, সাহাবায়ে কেরামের অনুকরণীয় জীবন ও সালাফে সালেহীনের বিশুদ্ধ কর্মরীতি দ্বারা সমুজ্জ্বল। আজকের ফিতনাময় পরিবেশে সুন্নাহ ও সালাফী মানহাজের উপর অটল থেকে দা'ওয়াহকে বিশুদ্ধ, কলুষমুক্ত ও মানবকল্যাণমুখী রাখা নিঃসন্দেহে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। অবশ্য সেই চ্যালেঞ্জের অন্তরেই লুকায়িত রয়েছে দায়িত্বের সম্মান ও উন্নতির সুবর্ণ সুযোগ –যদি উদ্দেশ্য থাকে শুধুই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অদম্য আকাঙ্ক্ষা।

বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস সেই আদর্শিক উত্তরাধিকার রক্ষা করে চলছে, যার শেকড় নববী দা'ওয়াহ'র উৎস থেকেই সিঞ্চিত। সংগঠনের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৪৬ সালে। তবে এর বিশ্বাস, মানহাজ, উদ্দেশ্য ও দর্শনের সূচনা সেই মুহূর্তেই, যখন রাসূল (ﷺ)-এর দাওয়াহ জাহেলিয়াতের অন্ধকার ভেদ করে সত্যের আলো ছড়াতে শুরু করে। এখানে নেই ব্যক্তিবাদ, বংশগৌরব বা অন্ধ অনুকরণের স্থান। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিষ্কার, প্রমাণ ও সালাফী মানহাজ সমর্থিত সঠিক বুঝে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও প্রচার।

আমাদের পূর্বসূরী আলেম, দাঈ', মুজাহিদ ও সংগঠকবৃন্দ দ্বীনি কর্মকে কখনো দুনিয়া প্রাপ্তির সিঁড়ি বানাননি; বরং ইখলাস ও তাক্বওয়ার চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে নিজেদের শ্রম, সময়, মেধা ও মনন মহান আল্লাহর পথে উৎসর্গ করেছেন। এখানেই আমাদের জন্য কালজয়ী উপদেশ–

সম্মান পদ থেকে জন্মায় না, শ্রদ্ধা জন্মায় কর্ম থেকে। পরিচয় রক্তধারায় নয়, উন্নত চরিত্রই সম্মানের বেলাভূমি।

আজ আমাদের কার্যক্রম বিস্তৃত ও বহুমাত্রিক। সহীহ দাওয়াহ, 'আক্বীদাহ্ সংশোধন, কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক শিক্ষা ও গবেষণা, সমাজসেবা, শিশু-যুব-নারী উন্নয়নকেন্দ্রিক বিভাগ, মসজিদ-মাদ্‌রাসা প্রতিষ্ঠা, মানবিক উদ্যোগ ও সমাজ সংস্কারমূলক কর্মসূচীসহ নানাবিধ কার্যক্রম বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আরো বৃদ্ধি পাবে ইন্‌শাআল্লাহ। তবে সব কর্মকাণ্ডের প্রাণশক্তি হতে হবে– ইখলাস, তাক্বওয়া ও সুন্নাহসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

কর্মের চেয়ে উদ্দেশ্যই মূল্যবান; সংখ্যা নয়, মানই আসল; আবেগ নয়, 'আমলই প্রকৃত পরিচয়।

আজ আমাদের প্রয়োজন– ইকতেদা, ইত্তিহাদ ও ইস্তিকামাহর পথে অবিচল থাকা। আমাদের দা'ওয়াহ হতে হবে জ্ঞানসমৃদ্ধ, হিকমতপূর্ণ, চরিত্রনিষ্ঠ, সময়োপযোগী ও সমাজে প্রভাব বিস্তারকারী। নেতৃত্বের প্রতিযোগিতা নয়, দায়িত্বপালনের তাড়না; বাহুল্য প্রচার নয়, নীরব এবং কার্যকর প্রভাব; মর্যাদার চিন্তা নয়, ঈমানের দৃঢ়তাই হোক আমাদের শক্ত ভিত্তি।

আসুন, আমাদের সংগঠনকে সম্প্রসারিত করি, কাজের পরিধি বৃদ্ধি করি, কর্মতৎপরতায় আনি দুর্বার গতি।

ব্যক্তিস্বার্থ নয়, দলীয় জৌলুস নয়; উম্মাহর কল্যাণ, দ্বীনের সর্বব্যাপী প্রচার ও পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠা, শুধু মহান রবের সন্তুষ্টির জন্য। মহান আল্লাহর কাছে আমাদের চিরায়ত প্রার্থনা :

"হে আমাদের রব! আপনি নিজের থেকে আমাদেরকে অনুগ্রহ দান করুন এবং আমাদের জন্যে আমাদের কাজ-কর্ম সঠিকভাবে পরিচালনার ব্যবস্থা করুন।" ☒

আল কুরআনুল হাকীম

মৃত্যুর অনুভূতি : এক ভয়ংকর বাস্তবতা!

–আবূ সা'আদ আব্দুল মোমেন বিন আব্দুস্ সামাদ★

আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

সরল বাংলায় অনুবাদ

"প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে এবং কিয়ামতের দিন তোমরা (তোমাদের প্রতিটি কাজের) পূর্ণ প্রতিদান পাবে। অতঃপর যাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হবে ও জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে, সে ব্যক্তিই সফলকাম। বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।"[১]

শাব্দিক অনুবাদ

كُلُّ -প্রত্যেক/প্রতিটি, نَفْسٍ -প্রাণী/যার প্রাণ আছে, ذَائِقَةُ -স্বাদ, الْمَوْتِ -মৃত্যু, وَ -এবং, إِنَّمَا -কিন্তু, تُوَفَّوْنَ -তোমাকে পূর্ণরূপে দেওয়া হবে/তোমাকে মৃত্যু দেওয়া হবে, أُجُورَكُمْ -তোমাদের কাজের মজুরি/প্রতিদান, يَوْمَ الْقِيَامَةِ -কেয়ামত দিবস, فَمَنْ -অতঃপর যাকে, زُحْزِحَ -দূরে রাখা হবে, عَنِ -হতে/থেকে, النَّارِ -আগুন (এখানে এটি দ্বারা জাহান্নামকে বুঝানো হয়েছে), أُدْخِلَ -তাকে/যাকে প্রবেশ করানো হয়েছে, الْجَنَّةَ -জান্নাতে, فَقَدْ فَازَ -তিনিই জয়ী হয়েছেন, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا -আর দুনিয়ার জীবন আর কিছুই নয়, إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ -প্রতারণার আনন্দ/তৃপ্তি ছাড়া।

সূরা ও আয়াত পরিচিতি

দরসে উল্লেখিত আয়াতটি কুরআনুল কারীমের তৃতীয় সূরা– সূরা আ-লি-'ইমরান থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি সূরা আ-লি-'ইমরান-এর ১৮৫ নং আয়াত।

শানে নুযুল বা অবতরণের প্রেক্ষাপট

এ আয়াতটির শানে নুযুল আ অবতরণের বিশেষ কোনো কারণ নেই, এটি একটি সাধারণ আয়াত যা জীবনের নশ্বরতা এবং মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবিতা সম্পর্কে বলেছে। এ আয়াতটি সমস্ত জীবন্ত সত্তার মৃত্যু অনিবার্য হওয়ার কথা ঘোষণা করে। এটি এমন একটি আয়াত যা পার্থিব জীবনের ক্ষণস্থায়ী ও প্রতারণামূলক প্রকৃতি তুলে ধরে এবং পরকালের চূড়ান্ত বিচারের উপর জোর দেয়।

আলোচ্য বিষয়

দারসে উল্লেখিত আয়াতটিতে চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। **এক-** মৃত্যুর অনিবার্যতা ও এর স্বাদ, **দুই-** জীবনের হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল প্রদান, **তিন-** চূড়ান্ত সফলতা লাভের উপায় ও **চার-** পার্থিব জীবনের প্রতারণা।

আয়াতের সংক্ষিপ্ত তাফসীর

মৃত্যুর অনিবার্যতা : দুনিয়ার চাকচিক্যে ও প্রতারণার মোহে আমরা পরকালকে ভুলে যাই। অথচ নির্দিষ্ট সময় শেষে আমাদেরকে সেখানেই যেতে হবে। কেউ কাউকে এ জগত সংসারে চিরকাল ধরে রাখতে পারবে না। প্রত্যেককেই এ জগত সংসার থেকে বিদায় নিতে হবে। এটাই মহান স্রষ্টার সিদ্ধান্ত। তিনি মৃত্যুর বিষয়টি চূড়ান্ত করার পরই জীবণ সৃষ্টি করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

﴿الَّذِيْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا﴾

অর্থ- "যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য যে, তোমাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম।"[২]

এ আয়াতে জীবনের পূর্বে মৃত্যুর কথা উল্লেখ করে এটাই বুঝানো হয়েছে যে, জীবনের গতি অনিশ্চিত হলেও মৃত্যু সুনিশ্চিত। মৃত্যু থেকে পালানোর কোনো পথ নেই। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন মৃত্যু সেখানেই উপস্থিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَ لَوْ كُنْتُمْ فِيْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾

★ এমফিল গবেষক, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

[১] সূরা আ-লি-'ইমরান : আয়াত নং- ১৮৫।

[২] সূরা আল-মুলক : ২।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

অর্থ- “তোমরা যেখানেই থাকো না কেন মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করো।”[৩]

যারা দুনিয়ার মোহে মোহাচ্ছন্ন তারা দুনিয়ায় সুউচ্চ ও সুদৃঢ় প্রাসাদ নির্মাণ করে, তারা মনে করে এখানে তারা দীর্ঘ সময় অবস্থান করবে। কিন্তু না, একটি নির্দিষ্ট সময়ে তাদেরকে তো এই সকল কিছু ছেড়ে চলে যেতে হবে সেই কৃবরে যার উপরে নীচে উভয় পার্শ্বে (ডাইনে ও বামে) থাকবে শুধুই মাটি আর মাটি। এই নির্দিষ্ট সময়টি যখন আসবে তখন তার পালানোর আর কোনো পথ থাকবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন–

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থ- “(হে রাসূল!) তুমি বলে দাও! নিশ্চয় যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ, তা অবশ্যই তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেই সত্তার কাছে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।”[৪]

প্রত্যেককেই সে নির্দিষ্ট সময়েই চলে যেতে হবে তা থেকে এক মুহূর্তকালও পূর্ব-পর হবে না। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন :

﴿فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُوْنَ سَاعَةً وَّلَا يَسْتَقْدِمُوْنَ﴾

অর্থ- “(আল্লাহ তাদেরকে একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত অবকাশ দিয়েছেন) অতঃপর যখন সে সময়টা চলে আসবে তখন তারা সেখান থেকে একমুহূর্তও আগপিছ করতে পারবে না।”[৫]

এই সময়ে মানুষ ভালো কাজ করার জন্য একটুসময় বাঁচার আকুতি করবে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿فَيَقُوْلَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِيْ إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيْبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِّنَ الصّٰلِحِيْنَ﴾

অর্থ- “সে বলবে, হে আমার প্রতিপালক! যদি তুমি আমাকে আরো কিছু সময় দিতে তাহলে আমি সাদাক্বাহ্ করতাম ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।”[৬]

[৩] *সূরা আন্-নিসা : ৭৮।*
[৪] *সূরা আল-জুমু‘আহ্ : ৮।*
[৫] *সূরা আন্-নাহ্ল : ৬১।*
[৬] *সূরা আল-মুনাফিকূন : ১০।*

মৃত্যুর স্বাদ : মৃত্যুর স্বাদ কেমন তা সঠিকভাবে বলা কঠিন, কারণ এটি একটি চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা বেঁচে থেকে কেউ এর সঠিক বর্ণনা দিতে পারে না। কুরআন-সুন্নাহ ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে মৃত্যু স্বাদ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে। মৃত্যুর সময়ে মানুষের কষ্ট হয় তবে বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের কষ্টের পরিমাণ ভিন্ন হয়। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে অক্সিজেনের অভাবে সাধারণতঃ মানুষের মস্তিষ্ক কাজ করা বন্ধ করে দেয়, যার ফলে তার এক ভিন্ন ধরনের অনুভূতি হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) (যিনি বিশ্ববাসীর জন্য রহমত হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন)-এর মৃত্যুর অনুভূতি সম্পর্কে হাদীসে এসেছে রাসূল (ﷺ)-এর যখন মৃত্যু যন্ত্রণা শুরু হয় তখন তিনি তাঁর স্ত্রী উম্মুল মু’মিনীন ‘আয়িশাহ্ সিদ্দিকা (রযিয়াল্লা-হু আনহা)’র বুকে ও কাঁধে ঠেস দিয়ে বসা অবস্থায় ছিলেন। অন্য বর্ণনায় এসেছে– ‘আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহা) বলেন, যখন মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন তাঁর মাথা ছিল আমার রানের উপর, তিনি বেহুঁশ হয়ে গেলেন। তারপর হুঁশ ফিরে এলো। তখন তিনি ছাদের দিকে চক্ষু নিবদ্ধ করলেন। অতঃপর বললেন,

«اَللّٰهُمَّ الرَّفِيْقَ الْأَعْلَىٰ».

অর্থ- “হে আল্লাহ! হে সর্বোচ্চ বন্ধু!”[৭] আর এটাই ছিল তাঁর শেষ কথা। অন্য একটি বর্ণনায় এসেছে তিনি পাশে রাখা পাত্রে হাত ডুবিয়ে (কুলিসহ) মুখ ধৌত করলেন। এ সময় তিনি বলতে থাকেন–

«لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ».

অর্থ- আল্লাহ তা‘আলা ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই মৃত্যুর রয়েছে অনেক কঠিন যন্ত্রণা![৮]

উপরোক্ত দুই বর্ণনার সমন্বয় এটাই হতে পারে যে, বুকের উপরে থাকা অবস্থায় নবীজি (ﷺ)-এর মৃত্যুরক্ষণ উপস্থিত হলে তিনি তাঁকে স্বীয় রানের উপরে শুইয়ে দেন এবং তখনই রাসূল (ﷺ) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দিনটি ছিল সোমবার। সময় সকাল ১০টা কিংবা ১১টা।

কাফিরদের মৃত্যুর স্বাদ : মৃত্যু হলো কাফিরদের জন্য এক ভয়াবহ শাস্তির সূচনা। মহান আল্লাহকে অবিশ্বাস ও তাঁর আদেশ অমান্য করার কারণে মৃত্যুর সময়ে ফেরেশ্তারা তাদের মুখে ও পশ্চাতে আঘাত করে এবং “জ্বলন্ত আগুনের ‘আযাব আস্বাদন করো” বলে তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

[৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৬৩।*
[৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৪৪৯।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ﴾

অর্থ- "অতঃপর তাদের অবস্থা কেমন হবে, যখন ফেরেশ্‌তারা তাদের মুখমণ্ডল ও পৃষ্ঠদেশসমূহে আঘাত করতে করতে তাদের জীবনাবসান (মৃত্যু) ঘটাবে!"[৯]

অন্যত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَ لَوْ تَرٰٓى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَ كُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ﴾

অর্থ- "আর যদি তুমি দেখতে, যখন যালিমরা মৃত্যু কষ্টে থাকে, এমতাবস্থায় ফেরেশ্‌তারা তাদের হাত প্রসারিত করে আছে (তারা বলে), 'তোমরা তোমাদের প্রাণ বের করো। আজ তোমাদেরকে লাঞ্ছনার 'আযাব দিয়ে প্রতিদান দেয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা কথা বলতে এবং তোমরা তার আয়াতসমূহ সম্পর্কে অহঙ্কার করতে।"[১০]

হাদীসে এসেছে– কাফের ব্যক্তিরা যখন দুনিয়া হতে বিদায় নেয় তখন তাদের কাছে কালো বর্ণের একদল ফেরেশ্‌তা এসে উপস্থিত হয়। তাদের সাথে থাকে দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়। চোখের দৃষ্টি যতদূর যায় তারা তথায় বসে থাকে। তারপর মালাকুল মাওত এসে তার মাথার পাশে বসেন। তাকে বলেন, ওহে অপবিত্র আত্মা! বেরিয়ে আয় মহান আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির দিকে। নবী করীম (ﷺ) বলেন, কাফির, মুনাফিক্ব ও পাপিষ্ঠ লোকের আত্মা তখন দেহের মাঝে পালাতে চেষ্টা করে। কিন্তু ফেরেশ্‌তা তাকে এমনভাবে টেনে বের করে যেমনিভাবে লোহার পেরেককে ভেজা পশমের মধ্য থেকে টেনে বের করা হয়। তার রূহ্ বের হওয়ার সময় শরীরের রগসমূহ ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যায়। রূহ্ বের করার পর ফেরেশ্‌তাগণ তাকে মালাকুল মাওতের হাতে চোখের পলক পরিমাণ সময়ও রাখেন না। তারা তাকে উক্ত দুর্গন্ধযুক্ত কাপড়ে রাখেন। তা থেকে মরা-পঁচা মৃত দেহের দুর্গন্ধের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। ফেরেশ্‌তাগণ তাকে আকাশের দিকে উঠাতে থাকে। যেখান দিয়েই গমণ করে সেখানকার ফেরেশ্‌তাগণ জিজ্ঞাসা করেন, এ অপবিত্র আত্মা কার? উত্তরে ফেরেশ্‌তাগণ অতি মন্দ নাম উচ্চারণ করে বলতে থাকেন, অমুকের পুত্র অমুকের। দুনিয়ার আকাশে পৌঁছে তার জন্য আকাশের দরজা খুলতে বলা হলে আকাশের দরজা খোলা হয় না। অতঃপর রাসূল (ﷺ) কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করলেন–

﴿لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ﴾

অর্থ- "তাদের জন্য আকাশের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে।"[১১]

অতঃপর তার রূহ্‌কে দেহে ফেরত দেয়া হয়। তখন দু'জন ফেরেশ্‌তা আগমন করেন এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তোর প্রভু কে? সে উত্তর দেয়, আফসোস! আফসোস! আমি জানি না। আবার জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের কাছে যে লোকটিকে পাঠানো হয়েছিল তার সম্পর্কে তোমার ধারণা কী? সে উত্তরে বলে, হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমি তাও জানি না। তখন আকাশ থেকে এক ঘোষক ঘোষণা করবে, এ লোক মিথ্যা বলছে। তাকে জাহান্নামের বিছানা বিছিয়ে দাও এবং তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খুলে দাও। যাতে তার কাছে গরম বাতাস ও তাপ পৌঁছতে পারে। তখন তার কবর অতি সংকীর্ণ করে দেয়া হয়। মাটি তাকে তখন এমনভাবে চেপে ধরে যাতে তার এক পার্শ্বের হাড্ডী অপর পার্শ্বে ঢুকে যায়। অতঃপর কালো চেহারা বিশিষ্ট, কালো পোষাক পরিহিত ও দুর্গন্ধযুক্ত এক ভয়ানক আকারের লোক এসে বলতে থাকে, তুই দুঃখের সংবাদ গ্রহণ করো। ধ্বংস হোক তোর! আজ তোর সেই দিন যার অঙ্গিকার তোর সাথে করা হয়েছিল। তখন কাফির বা মুনাফিক্ব ব্যক্তি বলে, তোমার পরিচয় কী? তোমার চেহারা দেখেই মনে হচ্ছে তুমি কোনো দুঃখের সংবাদ নিয়ে এসেছো। উত্তরে লোকটি বলবে, আমি তোর সেই খারাপ 'আমল যা তুই দুনিয়াতে করেছিলি। তখন সে বলবে, হে আল্লাহ! কিয়ামত যেন না হয়।[১২] শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ্ (রহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, মু'মিন ব্যক্তির রূহ্ কবয করার ব্যাপারে উপরোক্ত যে হাদীসে বলা হয়েছে, মু'মিনের রূহ্ ঐ আসমানে উঠানো হয় যেখানে আল্লাহ পাক রাব্বুল 'আলামীন রয়েছেন, তা একটি প্রসিদ্ধ

[৯] *সূরা মুহাম্মদ : ২৭।*
[১০] *সূরা আল-আন'আম : ৯৩।*
[১১] *সূরা আল-আ'রাফ : ৪০।*
[১২] *মুসনাদে আহমাদ- বারা ইবনু 'আযীবের হাদীস।*

হাদীস। এর সনদ ভালো। হাদীসে রয়েছে যে, فِيهَا اللهُ. (যাতে আল্লাহ তা'আলা রয়েছেন) এ কথাটি আল্লাহ তা'আলার নিম্নের বাণীর মতোই। আল্লাহ তা'আলা বলেন−

﴿ءَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ۖ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ﴾

অর্থ- "তোমরা কি এ থেকে নির্ভয় হয়ে গেছ যে, যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের মাটির মধ্যে ধসিয়ে দেবেন? অতঃপর ভুপৃষ্ঠ জোরে ঝাঁকুনি খেতে থাকবে, কিংবা যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষণ করবেন, এ ব্যাপারেও কি তোমরা নির্ভয় হয়ে গিয়েছো? তখন তোমরা জানতে পারবে আমার ভীতি প্রদর্শণ কেমন?"[১৩]

মৃত্যুর ধাপসমূহ− কোনো ব্যক্তির নিকট যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন তার কাছে ছয়টি ধাপে তা প্রকাশিত হয়।

প্রথম ধাপ : কারো জীবনের যেদিন পরিসমাপ্তি ঘটবে সেদিন আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা ফেরেশ্তাদের নির্দেশ দিবেন ঐ ব্যক্তির "রুহ্" কবজ করে নিয়ে আসতে। এই দিনটিকে বলা হয় "ইয়াউমুল মাউত"। এই দিনেও সে বুঝতে পারবে না যে, এই দিনটিই তার সেই নির্ধারিত মৃত্যুর দিন। মৃত্যুর বিষয়টি উপলব্ধি না করা সত্ত্বেও এই দিনে সে তার দেহে কিছু পরিবর্তন অনুভব করবে। মু'মিন (পূণ্যবান) হলে তার অন্তর প্রশান্তি অনুভব করবে। আর লোকটি বেঈমান (পাপিষ্ঠ) হলে বুকে খুব চাপ অনুভব করবে। এই ধাপে মৃত্যু পথযাত্রী শয়তান ও দুষ্ট জিন্দেরকে নামতে দেখবে কিন্তু উপস্থিত অন্যরা তাদের দেখবে না। এ ধাপটির কথাই কুরআনুল কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে বলা হয়েছে−

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ﴾

অর্থাৎ- "তোমরা সেইদিনকে ভয় করো। যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতঃপর প্রত্যেককে পরিপূর্ণরূপে বুঝিয়ে দেওয়া হবে তার কর্মফল এবং সেদিন তাদের উপর যুল্ম করা হবে না।"[১৪]

[১৩] *সূরা আল-মুলক : ১৬-১৭।*
[১৪] *সূরা আল বাক্বারাহ্ : ২৮১।*

দ্বিতীয় ধাপ : এটা হচ্ছে ধীরে ধীরে "রুহ্" কবজ করার পালা। এই ধাপে "রুহ্" পায়ের পাতা থেকে আরোহণ শুরু করে গোছা, হাঁটু, পেট, নাভি ও বুকের উপর হয়ে মানব দেহের "তারাক্বী" নামক স্থানে পৌঁছে যায়। এ সময়ে মানুষ ক্লান্তি ও অস্থিরতা অনুভব করে। এবং এক ধরনের অসহনীয় চাপ অনুভব করে। তখনও সে জানতে পারে না যে, তার "রুহ্" বের হয়ে যাচ্ছে।

তৃতীয় ধাপ : তারপর শুরু হয় তৃতীয় ধাপ। এ ধাপকে কুরআনুল কারীমের ভাষায় "তারাক্বী" বলা হয়। এ ধাপের কথা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে এভাবে−

﴿كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ ۜ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ﴾

অর্থাৎ- "কখনও না, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে এবং বলা হবে কে ঝাড়-ফুঁক করবে? এবং সে মনে করবে যে, বিদায়ের ক্ষণ এসে গেছে, পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যাবে।"[১৫]

"তারাক্বী" বলা হয় কণ্ঠনালীর নিচে দু'কাধ পর্যন্ত বিস্তৃত হাড়কে। কে ঝাড়-ফুঁক করবে? এ কথার অর্থ হলো− তখন আত্মীয়-স্বজনের কেউ কেউ এমন কাউকে খুঁজবে। যে তাকে ঝাড়-ফুঁক করবে। কেউ কেউ বলবে ডাক্তার ডাকি। কেউ আবার ইমারজেন্সিতে কল করবে। কেউ আবার দু'আ-কালাম পড়ে ফুঁ দিবে। এ পরিস্থিতিতেও সে সুস্থ জীবনে ফিরে আসার আশা করতে থাকবে। সে বিশ্বাসই করতে চাইবে না যে, তার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটছে, "রুহ্" তার দেহ ত্যাগ করছে। সে এখনো মৃত্যুর বিষয়ে নিশ্চিত নয় সে বাঁচার চেষ্টা করতে থাকবে। কিন্তু পায়ের গোছা যখন জড়িয়ে গেছে মৃত্যু এখন তার চূড়ান্ত। "রুহ্" গোছাদ্বয় থেকে বেরিয়ে গেছে সে এখন আর পা নাড়াতে পারছে না। প্রাণ এখন কণ্ঠাগত। কারণ "রুহ্" পৌঁছে গেছে "তারাক্বী"তে।

চতুর্থ ধাপ : এটাই দুনিয়াবী জীবনে মৃত্যুর শেষ স্তর। মানুষের জন্য এটি একটি চূড়ান্ত পর্যায়ের কঠিন স্তর। এ ধাপের নাম "হুলকুম"। আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন−

﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ﴾

[১৫] *সূরা আল ক্বিয়া-মাহ্ : ২৬-২৯।*

সূচীপত্র

অর্থাৎ- "প্রাণ যখন কণ্ঠাগত (কণ্ঠনালির উপরি ভাগে) হয় তখন তোমরা তাকিয়ে থাকো। আর আমি তোমাদের চেয়ে তার নিকটতর কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না।"[১৬]

এ ধাপ থেকেই পরকালের দর্শন স্তর শুরু হবে। উপস্থিত সকলে শুধু তাকেই দেখবে। কিন্তু সে দেখবে অন্যকিছু। সে হয়তো মহান আল্লাহর রহমত অথবা তাঁর 'আযাব-গযব দেখবে। এ সময়ে তার দিকে তাকালে দেখা যাবে– সে নির্দিষ্ট একটি জায়গায় একটি বিন্দুতে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ সময়ে তার চোখের পর্দা সরিয়ে দেয়া হবে। সে চারপাশে উপস্থিত ফেরেশ্তাদের দেখতে পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيْدٌ﴾

অর্থাৎ- "আমি তোমার সামনে থেকে পর্দা সরিয়ে দিয়েছি। এখন তোমার দৃষ্টি প্রখর।"[১৭]

এটাই মানুষের জীবনের সবচেয়ে কঠিন মুহূর্ত! কেননা এ সময় সে মহান আল্লাহর সকল প্রতিশ্রুতি ও 'আজাব-গজব দেখতে পায়। ফেরেশ্তাদের দেখতে পায়। জীবনে যা যা করেছে সব তার চোখের সামনে ভাসতে থাকে। এ সময় মৃত্যুর ফিতনা ঘটে। শয়তান এ ফিতনায় প্রবেশ করে 'আক্বিদায় সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকে। সে সকল শক্তি দিয়ে তাকে বিভ্রান্ত করে (কাফির/বেদ্বীন বানিয়ে) দুনিয়া থেকে বিদায় করে জাহান্নামে পাঠানোর সর্বান্তকরণে চেষ্টা করতে থাকে। কেননা এটাই শয়তানের জন্য তাকে গোমরাহ্ করার সর্বশেষ সময়, সে এখন মৃত্যু নিকটবর্তী। এ জন্য শয়তান অতীতের যে কোনো সময়ের চেয়ে অনেক শক্তিশালী চূড়ান্ত আঘাত হানতে থাকে। এ ফিতনা অত্যন্ত ভয়ংকর! তাই আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা আমাদেরকে এ থেকে আশ্রয় চাইতে বলেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۙ وَاَعُوْذُ بِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ﴾

অর্থাৎ- "আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক! আমি আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি শয়তানের প্ররোচনা থেকে এবং আপনার নিকট আশ্রয় চাচ্ছি তাদের উপস্থিতি থেকে।"[১৮]

শয়তান এ সময়ে কোনো একজন নিকট আত্মীয়ের আকৃতিতে উপস্থিত হয় (এমন একজনের আকৃতি যে আগেই মারা গেছে)। সে উচ্চ কণ্ঠে চিৎকার করে বলতে থাকে– আমি অমুক, তোমার পূর্বে মারা গেছি। আমি জানি ইসলাম সত্য ধর্ম নয়, নবী সত্য দ্বীন নিয়ে আসেনি, সে আরো বলবে তুমি এগুলো অস্বীকার করো। এ মুহূর্তে সে যদি এসব অস্বীকার করে শয়তান সফল হয় কিন্তু তাকে ধিক্কার দেয়। এ পরিস্থিতির চিত্র আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পবিত্র কুরআনে এভাবে উল্লেখ করেছেন–

﴿كَمَثَلِ الشَّيْطٰنِ اِذْ قَالَ لِلْاِنْسَانِ اكْفُرْ ۚ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ اِنِّيْ بَرِيْٓءٌ مِّنْكَ اِنِّيْٓ اَخَافُ اللهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ﴾

অর্থাৎ- "তাদের উপমা হচ্ছে শয়তান যখন তাকে বলবে তুমি কুফ্রী করো, যখন সে কুফ্রী করবে তখন শয়তান আবার বলবে (তাকে ধিক্কার দিয়ে) তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি।"[১৯]

পঞ্চম ধাপ : রাসূল (ﷺ) এ স্তর সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এ ধাপে মালাকুল মাউত (মৃত্যুদূত/আজরাঈল) প্রবেশ করবে। মৃত্যুপথযাত্রী পূর্ণরূপে বুঝতে পারবে সে এ বিদায় বেলা কি নিয়ে যাচ্ছে? সে কি জান্নাতী না জাহান্নামী তাও বুঝতে পারবে। সে তার কাজ-কর্মের ফলাফল দেখবে, পরিণতি সম্পর্কে জানতে পারবে। সে যদি ইসলাম অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করে থাকে এবং তার অন্তরে যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-এর ভালোবাসা থাকে তাহলে সে এ অবস্থাতেই দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে। পক্ষান্তরে যে বিভিন্ন রকমের কবীরা গুনাহ যেমন- শির্ক-কুফুর, যিনা-ব্যভিচার, চুরি-ডাকাতি, মদ-জুয়া, সুদ-ঘুষ, পিতা-মাতার অবাধ্য এমন সকল পাপ নিয়ে তাওবাহ্ না করে এ স্তরে এসে পৌঁছেছে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত ভয়ানক! আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা বলেন–

﴿وَالنّٰزِعٰتِ غَرْقًا﴾

অর্থাৎ- "শপথ সেই সকল ফেরেশ্তাদের! যারা নির্মমভাবে (রুহ্) টেনে বের করে।"[২০]

জাহান্নামের একদল নির্ধারিত ফেরেশ্তা আছে যারা আগুনের কাফন প্রস্তুত করে রাখে। এরা খুব নির্দয়ভাবে

---

[১৬] *সূরা ওয়া-ক্বি'আহ্ : ৮৩-৮৫।*
[১৭] *সূরা ক্বাফ : ২২।*
[১৮] *সূরা আল মু'মিনূন : ৯৭-৯৮।*
[১৯] *সূরা আল হাশ্‌র : ১৬।*
[২০] *সূরা আল নাযি'আত : ১।*

পাপী ব্যক্তির "রুহ্" কবজ করে। এ পরিস্থিতির চিত্র বর্ণনা করে আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَلَوْ تَرَىٰٓ اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِيْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ؕ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ﴾

অর্থাৎ- "এবং যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমগণ মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে আর ফেরেশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে– তোমাদের প্রাণ বের করো, তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে অন্যায় কথা বলতে এবং তাঁর নিদর্শনে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সে জন্য আজ তোমাদের অবমাননাকর শাস্তি দেওয়া হবে।"[২১]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন–

﴿فَكَيْفَ اِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ﴾

অর্থাৎ- "ফেরেশ্তারা যখন তাদের মুখমণ্ডল এবং পৃষ্ঠদেশে আঘাত করতে করতে তাদের প্রাণ হরণ করবে তখন তাদের কি দশা হবে!"[২২]

ষষ্ঠ ধাপ : এ ধাপে মানুষের "রুহ্" সম্ভাব্য সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যায় এবং "রুহ্" বের হওয়ার জন্য এবং মালাকুল মাউতের কাছে আত্মসমর্পণের জন্য নাকে-মুখে অবস্থান করবে। ব্যক্তি যদি পাপিষ্ঠ হয় মালাকুল মাউত তার "রুহ্"কে বলবে– হে নিকৃষ্ট আত্মা! তুই আগুন ও জাহান্নামের এবং ক্রোধান্বিত ও প্রতিশোধ পরায়ন প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে বের হয়ে আয়! তখন লোকটির অভ্যন্তরীণ চেহারা কালো হয়ে যাবে এবং সে চিৎকার করে বলবে–

﴿رَبِّ ارْجِعُوْنِ لَعَلِّيْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا تَرَكْتُ﴾

অর্থাৎ- "হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় ফেরত পাঠান যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।"

তখন সে শুনতে পাবে–

﴿كَلَّا ؕ اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ؕ وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ﴾

[২১] *সূরা আল আন'আম : ৯৩।*
[২২] *সূরা মুহাম্মদ : ২৭।*

অর্থাৎ- "না, এটা হতে পারে না। এটি তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে বারযাখ (যবনিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"[২৩]

পক্ষান্তরে লোকটি যদি পূণ্যবান হয় মালাকুল মাউত তার "রুহ্"কে বলবে–

﴿يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾

অর্থাৎ- "হে পরিতৃপ্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে।" (তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন–)

﴿فَادْخُلِيْ فِيْ عِبٰدِيْ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ﴾

"আমার বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো!"[২৪]

এরপর আত্মাটি বের হয়ে যায় আর লোকটি তার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে।

মৃত্যুর স্মরণই মানুষকে আল্লাহভীরু ও সৎকর্মশীল বানায় এবং জীবনকে সুন্দর করে সাজিয়ে তোলে : মৃত্যু মানুষের জীবনের সকল আশা ও আকাংখা মুহূর্তের মধ্যে বিলীন করে দেয়। সকল হাসি সেদিন কান্নায় পরিণত হয়। তাই মানুষ মরতে চায় না। সদা-সর্বদা সে মৃত্যু থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায়। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِيْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ﴾

অর্থ- "তুমি বলে দাও, নিশ্চয়ই যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াচ্ছ, সে মৃত্যু অবশ্যই তোমাদের কাছে উপস্থিত হবে। অতঃপর তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে সেই সত্তার কাছে, যিনি অদৃশ্য ও দৃশ্যমান সবকিছু সম্পর্কে অবগত। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দিবেন।"[২৫]

সে সময় মানুষ বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি যদি আমাকে আরো কিছু সময় দিতে, তাহলে আমি সদ্বাকা করে আসতাম ও সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। অথচ নির্ধারিত সময়কাল যখন এসে যাবে, তখন আল্লাহ কাউকে আর অবকাশ দিবেন না। বস্তুতঃ তোমরা যা করো, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবহিত।[২৬]

[২৩] *সূরা আল মু'মিনূন : ৯৯-১০০।*
[২৪] *সূরা আল ফাজর : ২৭-৩০।*
[২৫] *সূরা আল-জুমু'আহ্ : ৮।*
[২৬] *সূরা আল-মুনাফিকূন : ১০-১১।*

অন্য আয়াতে এসেছে– “অবশেষে যখন তাদের কারো কাছে মৃত্যু এসে যায়, তখন সে বলে হে আমার পালনকর্তা! আমাকে পুনরায় (দুনিয়াতে) ফেরত পাঠান। যাতে আমি সৎকর্ম করতে পারি যা পূর্বে আমি করিনি। কখনই না। এটা তো তার একটি (বৃথা) উক্তি মাত্র যা সে বলে।”[২৭]

এই মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করলেই জীবন সুন্দর হয়। কেউ যদি জানতে পারে যে একটু পরেই তার মৃত্যু হবে, সে তখন আর খারাপ কাজ করতে পারে না। ভালো কাজ করার ইচ্ছা তখন তার মাঝে প্রবল হয়ে উঠে। তাই বলা যায় মৃত্যুও স্মরণই মানুষকে মন্দ কাজ থেকে দূরে রাখে এবং ভালো কাজ করার উৎসাহ যোগায়। আর এ জন্যই রাসূল (ﷺ) মৃত্যুকে বেশি বেশি করে স্মরণ করতে বলেছেন। তিনি বলেন–

«أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّذَّاتِ»، يَعْنِي الْمَوْتَ.

অর্থ- তোমরা অধিক পরিমাণে জীবনের স্বাদ হরণকারী অর্থাৎ- মৃত্যুকে স্মরণ করো।[২৮]

জীবনের হিসাব গ্রহণ ও কর্মফল প্রদান : মৃত্যুর মাধ্যমে এই জীবনের শুধু পরিসমাপ্তীই ঘটে না; বরং এই জীবনের প্রতিটি কর্মের হিসাব গ্রহণ করা হয় এবং যথোপযুক্ত কর্মফল প্রদান করা হয়। তাই আল্লাহ তা‘আলা বলেন–

﴿وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

অর্থাৎ- “কিয়ামতের দিন তোমরা (তোমাদের প্রতিটি কাজের) পূর্ণ প্রতিদান পাবে।”[২৯]

মৃত্যুপরবর্তী জীবনে সফলতা ও ব্যার্থতা : তাওবার মাধ্যমে ও পার্থিব জীবনে অপরাধ পরিত্যাগ করে যে ধীরে ধীরে জাহান্নামের শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ করেছে, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে, মৃত্যুপরবর্তী জীবনে সেই সফলতা লাভ করেছে। আর যে ব্যক্তি তা করতে পারেনি তার জীবন ও মৃত্যু সবই ব্যার্থতায় পর্যভুষিত হয়েছে।

পার্থিব জীবনের প্রতারণা : আমরা এই জীবনের মোহে আচ্ছন্ন হয়ে উন্নত জীবন যাপনের আশায় কত অপরাধই না করে থাকি। কিন্তু আমরা কি একবারও ভেবে দেখেছি এ জীবন ক্ষণস্থায় ও ছলনাময় যে কোনো সময় আমাদেরকে এই জীবনের মোহ ত্যাগ করে চিরস্থায়ী জীবনে পারি জমাতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু তা‘আলা বলেন–

﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ﴾

অর্থ- “বস্তুতঃ পার্থিব জীবন প্রতারণার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়।”[৩০]

অন্যত্র তিনি আরো বলেন–

﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ۞ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى﴾

অর্থ- “কিন্তু তোমরা দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী।”[৩১]

আর এই চিরস্থায়ী জীবনেই পার্থিব জীবনের ভালো-মন্দ সকল কর্মের ফল ভোগ করতে হবে। সুতরাং চিরস্থায়ী জীবনে ভালো থাকার জন্য আমাদেরকে বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করে দুনিয়ার জীবনকে ভালো কাজ দ্বারা সাজিয়ে তুলতে হবে।

দারসের শিক্ষাসমূহ

এক- প্রতিটা প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মৃত্যু থেকে কেউ পালিয়ে যেতে পারবে না সুতরাং এই মৃত্যুর কথা বেশি বেশি স্মরণ করে নিজেকে আল্লাহভিরু ও সৎকর্মশীল হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

দুই- কিয়ামত দিবসে দুনিয়াবী জীবনের সকল কর্মের প্রতিদান দেওয়া হবে। অতএব, দুনিয়ার জীবনে এমন কাজ করতে হবে যেন মৃত্যুপরবর্তী জীবনে ভালো ফলাফল ভোগ করা যায়।

তিন- দুনিয়ার জীবন প্রতারনার বস্তুদ্বারা আচ্ছাদিত। সুতরাং দুনিয়ার জীবনের উপর পরকালের জীবনকে প্রাধান্য দিতে হবে।

চার- আমাদের প্রত্যেকেরই প্রতিদিন জাহান্নাম থেকে বেঁচে থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে।

পাঁচ- মৃত্যুর ভয়ানক যন্ত্রনার ভয়ে মৃত্যু থেকে পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা না করে জীবনকে সুন্দর করে গঠনের চেষ্টা করতে হবে। আসুন! আমরা সবাই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করে জীবনকে সুন্দর করে সাজানোর চেষ্টা করি। হে আমাদের প্রতিপালক! আপনি আমাদেরকে সুন্দর জীবন গঠনে সাহায্য করুন, মৃত্যুপূর্ব ও পরবর্তী জীবনে আমাদেরকে সফলতা দান করুন এবং মৃত্যুর যন্ত্রনা থেকে আমাদেরকে মুক্তি দিন –আমীন। ☒

---

[২৭] *সূরা আল-মু’মিনূন : ৯৯-১০০।*
[২৮] *সুনান ইবনু মাজাহ্- হা. ৪২৫৮, হাসান সহীহ।*
[২৯] *সূরা আ-লি-‘ইমরান : ১৮৫।*
[৩০] *সূরা আ-লি-‘ইমরান : ১৮৫।*
[৩১] *সূরা আল-‘আলা- : ১৬ ও ১৭।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

হাদীসে রাসূল (ﷺ)

দীনের উপর অবিচল থাকার অপরিহার্যতা

–আব্দুল মুমিন বিন আব্দুল খালিক★

রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর অমিয় বাণী

عن سفيان بن عبد الله الثقفي، قال : قلت : يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك – وفي حديث أبي أسامة غيرك – قال : "قل : آمنت بالله، فاستقم" قَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ فَأَيَّ شَيْءٍ أَتَّقِي؟ قَالَ : "فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ".

সরল অনুবাদ

সুফ্‌ইয়ান ইবনু ‘আব্দুল্লাহ আস্ সাক্বাফী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন : আমি রাসূল (ﷺ)-কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! ইসলামের এমন একটি কথা আমাকে বলুন, যা আমি আপনার পর আর কাউকে জিজ্ঞাসা করবো না। আবূ ‘উসামাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রয়েছে; আপনি ব্যতিত। রাসূল (ﷺ) বললেন : তুমি বলো যে, আমি ঈমান আনলাম, অতঃপর এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকো। তিনি বললেন; হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! কোন বস্তু থেকে আমি সতর্ক থাকবো? তিনি বললেন : রাসূল (ﷺ) তাঁর হাত দ্বারা জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন।[৩২]

হাদীসের প্রাসঙ্গিক বিষয়

আলোচ্য হাদীসে অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে যা প্রতিটি মুসলিমের জন্য জানা এবং মানা অপরিহার্য। (১) মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা। (২) ঈমানের উপর অবিচল থাকা। (৩) জবানের হেফাজত করা। এ তিনটি বিষয় মুসলিম মাত্রই সকলের জন্য অত্যন্ত জীবনঘনিষ্ঠ ও অত্যবশ্যকীয়। নিম্নে এর সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হলো।

সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ

রাসূল (ﷺ)-এর কথা :

"آمنت بالله،...".

বলো; আমি মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করলাম।

এখানে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা বলতে মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাত, রুবুবিয়্যাত এবং আসমাউ ওয়াস্‌সিফাত তথা মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করা বুঝায়। সবার আগে মহান আল্লাহর একত্ববাদের উপর বিশ্বাস করা ফর্‌য। অর্থাৎ- রব্ব, ইলাহ, মা’বূদ ও গুণাবলিতে আল্লাহ তা‘আলা এক ও অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা এবং কাজে বাস্তবায়ন করা। আর এসবকিছুতে মহান আল্লাহর একত্বর উপর বিশ্বাস করাকেই তাওহীদ বলা হয়।

মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ আল উসাইমীন (রহিমাহুল্লাহ) বলেন : الْإِيْمَانُ بِاللهِ বা মহান আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে এবং এ চারটি বিষয় ব্যতীত কোনোক্রমেই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যাবে না। (১) মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, (২) মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করা, (৩) মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করা, (৪) মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করা।

মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা : মহান আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা ঈমানের আবশ্যকীয় বিষয়, এটা ছাড়া একজন মানুষ কখনোই ঈমানদার হতে পারবে না। অস্তিত্বের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা‘আলা এক, অদ্বিতীয়, সমকক্ষ ও সাদৃশ্যহীন। তিনি সর্বকালেই সমভাবে অস্তিত্ববান ও ক্ষমতাবান। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ﴾

★ *মুহাদ্দিস, মাদ্‌রাসা মুহাম্মাদীয়া আরাবীয়া যাত্রাবাড়ী, ঢাকা। পাঠাগার সম্পাদক, বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঢাকা মহানগর দক্ষিণ।*

[৩২] *মুসনাদ আহমাদ- হা. ১৫৪১৭।*

“তিনি প্রথম তিনিই শেষ, তিনি প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এবং তিনি সকল বিষয়ে মহাজ্ঞানী।”[৩৩]

মহান আল্লাহর রুবুবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস : মহান আল্লাহর একক রুবুবিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করা। অর্থাৎ- আল্লাহ তা‘আলা একক স্রষ্টা, একক ক্ষমতাবান ও একক নিয়ন্ত্রক বলে বিশ্বাস করা, আর এটাই তাওহীদ আর রুবুবিয়্যাহ। সমগ্র সৃষ্টজগতকে আল্লাহ তা‘আলা একভাবে সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে তার কোনো শরীক নেই। তিনি একক ক্ষমতাবান, সকল ক্ষমতার উৎস একমাত্র তিনি, তিনি ব্যতীত কোনো ক্ষমতাবান নেই, তিনিই একমাত্র ক্ষমতার উৎস। এ মহা সৃষ্টিজগতের নিয়ন্ত্রক একমাত্র আল্লাহ তা‘আলা, তিনি কারো নিয়ন্ত্রণাধীন নন সবকিছুই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, আর এক্ষেত্রে তাঁর কোনো অংশীদার নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِيْ سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيْعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهِ ذٰلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ﴾

“নিশ্চয় তোমাদের রব্ব আল্লাহ তা‘আলা যিনি ছয়দিনে আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশের উপর সমুন্নত হয়েছেন। তিনি সকল বিষয়াদী পরিচালনা করেন। তাঁর অনুমতি প্রাপ্তি ব্যতীত সুপারিশ করার কেউ নেই। তিনিই তোমাদের আল্লাহ, পালনকর্তা। সুতরাং তোমরা তাঁরই ‘ইবাদত করো, তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করবে না?”[৩৪]

মহান আল্লাহর উলুহিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করা : মহান আল্লাহর একক উলুহিয়্যাতের প্রতি বিশ্বাস করা, যা তাওহীদ আল উলুহিয়্যাহ বা আত্ তাওহীদুল ‘ইবাদাহ নামে পরিচিত। এখানে ইলাহ বা উলুহিয়্যাহ বলতে মা‘বূদ উদ্দেশ্য। অর্থাৎ- সমস্ত ‘ইবাদত একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলার জন্য, তিনি ব্যতীত ‘ইবাদতের যোগ্য কেউ নেই। আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ﴾

“মানুষ ও জিন্ জাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ‘ইবাদত করার জন্য।”[৩৫]

সুতরাং এক মহান আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থ হলো সকল ‘ইবাদত একমাত্র তাঁর উপর ন্যাস্ত করার মধ্যেই নিহিত রয়েছে। তাঁর দাসত্ব ব্যতীত ঈমানের কোনো মূল্য নেই।

মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করা : মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করা, এটা অনেক গুরত্বপূর্ণ একটি বিষয়। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাসকে কেন্দ্র করে অনেকেই পথভ্রষ্ঠ হয়েছে হচ্ছে এবং হয়তো হবেও। আল্লাহ তা‘আলা আমাদের হেফাজত করুন। মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলিতে বিশ্বাস করার অর্থ হলো– আল্লাহ তা‘আলা তাঁর কিতাবে নিজের জন্য যে নাম ও গুণাবলি নির্বাচন করেছেন এবং নবী (ﷺ) সুন্নাহয় মহান আল্লাহর যে নাম ও গুণাবলি উল্লেখ করেছেন সেগুলোর প্রতি সংশয়মুক্ত ঈমান আনয়ন করা এবং তাতে কোনো ধরণের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন ও ব্যাখ্যা না করা। যেমন- আমাদের দেশের মাযহাব পন্থিগণ কর্তৃক মহান আল্লাহর হাতকে কুদরাতি হাত বলা, সত্ত্বাগতভাবে আল্লাহ তা‘আলা সর্বত্র বিরাজমান বলে বিশ্বাস করা, মহান আল্লাহর গুণাবলিকে কুদরাত বা ক্ষমতা বলে ব্যাখ্যা করা ইত্যাদি। এসব স্পষ্ট কুফ্‌রি ও ভ্রষ্ঠতা। ইসলামে এমন অনেক দল রয়েছে যারা মহান আল্লাহর গুণাবলি অস্বীকার করার কারণে ইসলাম থেকে বেরিয়ে গেছে।

এ চারটির কোনো একটির প্রতি অবিশ্বাসী হলে কিংবা বিশ্বাসে সংশয় প্রকাশ করলে ঈমান বাতিল হয়ে যাবে।

নবী (ﷺ)-এর কথা :

"فاستقم".

অর্থাৎ- তার উপর অবিচল থাকো।

এর অর্থ দাঁড়ায় শুধু ঈমান আনয়ন করলেই যে প্রকৃত মু’মিন হওয়া যাবে বিষয়টি এমন নয়; বরং ঈমানের উপর অবিচল থাকা এবং দীনের সঠিক মানহাজের

---

[৩৩] *সূরা আল-হাদীদ : ৩।*

[৩৪] *সূরা ইউনুস : ৩।*

[৩৫] *সূরা আয্ যা-রিয়া-ত : ৫৬।*

উপর প্রতিষ্ঠিত থাকা সবথেকে বেশি গুরত্বপূর্ণ। ঈমান আনা যতোটা কঠিন ঈমানের উপর অবিচল থাকা তার চেয়েও বেশি কঠিন। শীয়া, মু'তাযিলা, খারেজীয়া, রাফিযীয়া, মুরজীয়া, জাহমীয়া, কাদেরীয়া ও কাদীয়ানিয়াসহ বেশ কয়েকটি গোষ্ঠি ঈমান এনেছে বটে কিন্তু তারা ঈমানের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। এর ফলে তারা বিভ্রান্ত ও পথভ্রষ্ঠ হয়েছে। বর্তমান সময়েও অনেক মানুষ আছে যারা সালাফীয়াতকে গ্রহণ করেও তার উপর অবিচল থাকতে পারেনি; বরং বিভিন্ন ভ্রান্ত মানহাজের দিকে ধাবিত হয়েছে; কেউবা মুনকিরুস সুন্নাহ বা হাদীস অস্বীকারকারীদের দিকে ঝুকে পড়েছে আবার কেউবা মু'তাযিলাদের দিকে ঝুকে পড়েছে। যা সত্যিই বেদনাদায়ক। অথচ বিলাল বিন রাবাহ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু)-এর দিকে লক্ষ্য করুন হাজারো নির্যাতনের মাঝেও তিনি বিচ্যুত হননি।[৩৬]

ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও দীন থেকে বিচ্যুত হননি; বরং সে সময় তিনি বলেছিলেন :

حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.

আমার জন্য আল্লাহ তা'আলাই যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম কর্মবিধায়ক।[৩৭]

সুতরাং শুধু ঈমান আনয়ন করা নয়; বরং ঈমানের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকাই বড় বিষয়। আর ঈমানের ওপর অবিচল থাকলেই তার জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَأَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِيْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ﴾

“নিশ্চয় যারা বলে আমাদের রব্ব আল্লাহ তা'আলা অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাদের উপর ফেরেশ্‌তারা অবতীর্ণ হয় এবং তারা বলে; তোমরা ভয় পাবে না ও চিন্তিতও হবে না, তোমরা জান্নাতের সুসংবাদ নাও যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছে।”[৩৮]

নবী (ﷺ)-এর কথা :

"فَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى لِسَانِهِ."

“তিনি তার জিহ্বার দিকে ইশারা করলেন।”

এর অর্থ হলো– নবী (ﷺ) তাকে জিহ্বার হেফাজত করার উপদেশ প্রদান করলেন, কারণ জিহ্বার কারণেই সমধিক পাপের কাজে মানুষ নিমজ্জিত হয়। সাহ্‌ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন :

«مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ».

যে ব্যক্তি আমার জন্য জিহ্বা ও লজ্জাস্থানের হেফাজতের দায়িত্ব নিবে আমি তার জন্য জান্নাতের জিম্মাদার হবো।[৩৯]

হাদীসের শিক্ষা

১. ‘আমল করার আগে জানা জরুরি। না জেনে ‘আমল করলে সারা জীবনের ‘আমল বৃথা হতে পারে।

২. দীনের বিষয়ে জানার জন্য অবশ্যই যোগ্যতম মানুষের কাছে যেতে হবে। অর্থাৎ- যিনি শরীয়ত সম্পর্কে অভিজ্ঞ তার কাছেই শরীয়তের বিষয়ে জানতে হবে।

৩. ‘আমলের আগে ঈমান আনয়ন করা অপরিহার্য, কারণ ঈমান ব্যতীত ‘আমলের কোনো মূল্য নেই।

৪. ঈমান আনয়ন করার থেকেও গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো ঈমানের উপর টিকে থাকা। আর ঈমানের ওপর টিকে থাকার অর্থ হলো ঈমানের বিশুদ্ধতা নিশ্চিত করা এবং সে অনুযায়ী ‘আমল করা, কারণ ‘আমলহীন ঈমানও অকার্যকর।

৫. ঈমানের উপর টিকে থাকতে হলে জিহ্বার হেফাজত করা আবশ্যক, কারণ জিহ্বার মাধ্যমেই সবথেকে বেশি পাপ সংঘটিত হয়।

৬. আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ঈমানের উপর সর্বদা প্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক্ব দান করুন, আমীন। ☒

---

[৩৬] *তাবাক্বাতুল কুবরা- ৩/১৭৫-৩/১৮০ পৃ.।*
[৩৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ৪৫৬৪।*
[৩৮] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্সিলাত : ৩০।*
[৩৯] *সহীহুল বুখারী : হা. ৬৪৭৪।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

প্রবন্ধ

প্রসঙ্গ : বৈধ উপার্জন

–আবু সা'দ ড. মো. ওসমান গনী★

উভ-জাগতিক কল্যাণসমূহের গ্র্যান্টার হলো ইসলাম। ইসলামে রয়েছে হালাল-হারামের সুস্পষ্ট বিধান। হালাল পন্থা অবলম্বন, আবার হারাম পরিত্যাগের মাধ্যমে ইসলাম অনুসরণের বাস্তবতা উপলব্ধি করা যায়। ইসলাম মানবজাতির সব কল্যাণকর ও উপকারি বস্তু হালাল করেছে। কুরআনুল কারীমে হারাম এবং তাইয়্যেব শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। শব্দ দু'টোর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের কাছে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তারা পৃথিবীতে যা কিছু হালাল ও তাইয়্যিব আছে তা আহার করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ﴾

অর্থ : "হে মানুষ! পৃথিবীতে হালাল ও তাইয়্যেব যা কিছু আছে তা থেকে আহার করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।"[৪০]

এখানে হালাল অর্থ বৈধ উপার্জন এবং তাইয়্যিব শব্দটি নির্দিষ্ট করে যে, শুধু বৈধ হলেই চলবে না তা অবশ্যই উত্তম ও পবিত্র হতে হবে। তাইয়্যিব বলতে বুঝানো হয়েছে এমন উপায় যা ভেজালমুক্ত স্বাস্থ্যসম্মত এবং সর্বোচ্চ মানের। সূরা আল-কাহ্‌ফ-এ খাদ্যের মান সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে।

﴿فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ﴾

বর্ণিত বিষয়ের আয়াতাংশের অর্থ হলো– "সে যেন দেখে কোন্ খাদ্য উত্তম তারপর তা থেকে যেন কিছু খাদ্য নিয়ে আসে।"[৪১]

এখানে খাদ্যের উত্তমতার কথা প্রতিভাত হলেও এতে শুধুমাত্র গুণগত উত্তমতাকে বুঝায় না। এখানে হালালের বিষয়ও নিহিত আছে। আর এই হালাল নির্ণয় করতে গিয়ে অংশবিশেষকে ব্যবহার না করা কিংবা পরিত্যাগ করা কোনো ভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এ সম্পর্কে কুরআনুল কারীমের সূরা ইউনুসে আলোকপাত করা হয়েছে–

﴿قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾

অর্থ : "তোমরা আমাকে বলো, আল্লাহ তোমাদেরকে জীবনের যে উপকরণ দিয়েছেন তোমরা যে তার কিছু হালাল ও কিছু হারাম করেছ আল্লাহ কি তোমাদেরকে এর অনুমতি দিয়েছেন? না, তোমরা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করছ?"[৪২]

সুপ্রিয় পাঠকবৃন্দ! মহান আল্লাহর প্রবর্তিত বিধানের আলোকে প্রতিটি হুকুম-আহকাম অবিকল অনুসৃত হবে এটাই দ্বীনের দাবি। কথঞ্চিৎ সরে মাখলুকের মতবাদ আরোপিত হলে তা হবে অগ্রহণযোগ্য।

এখানে উপার্জিত দ্রব্য ও উপার্জনের দু'টিতে হালাল-হারামের ফর্মুলা জড়িয়ে আছে। বাহ্যতঃ হালাল কিন্তু অর্জিত হয়েছে হারাম উপায়ে –তা হলো হারাম। হারাম অর্জিত হয়েছে হালালভাবে তাও সর্বৈব হারাম। এতে প্রতীয়মান হয় যে, উপার্জনের ক্ষেত্রে যে উপায় বা মাধ্যম গ্রহণ করা হবে, তা অবশ্যই বৈধ হতে হবে। ইসলাম কোনোভাবেই অবৈধ উপায় দ্বারা অর্থ উপার্জন করতে অনুমতি দেয় না। কুরআনুল হাকীমে বর্ণিত একাধিক আয়াতে মু'মিনদের সতর্ক করা হয়েছে। কঠোর 'আযাবের উদ্ধৃতি দিয়ে আরো সতর্ক করা হয়েছে যে,

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾

"হে মু'মিনগণ! তোমরা একে অপরের সম্পত্তি অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না, তবে তোমরা পরস্পর রাজি হয়ে ব্যবসা

★ **ভাইস-প্রেসিডেন্ট,** বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস। **প্রফেসর ও পরিচালক,** এশিয়ান ইন্সটিটিউট এবং **সাবেক ডিন, স্কুল অব আর্টস,** এশিয়ান ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ।

[৪০] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৬৮।

[৪১] সূরা আল-কাহ্‌ফ : ১৯।

[৪২] সূরা ইউনুস :

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

করলে তা বৈধ এবং একে অপরকে হত্যা করো না; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি পরম দয়ালু।"[৪৩]

আল্লাহ তা'আলা সীমালঙ্ঘনের পরিসীমা উল্লেখ করে কঠিন 'আযাবের বিষয়ে হুশিয়ারী উচ্চারণ করে আরো বলেন– "আর যে কেউ সীমালঙ্ঘন করে অন্যায়ভাবে তা করবে, তাকে আমি অগ্নিতে দগ্ধ করব, আর এটা করা আল্লাহর পক্ষে সহজ।"[৪৪]

দ্রব্যের পবিত্রতা ও অর্জনের উপায় ইসলাম খুবই কঠোরভাবে বিবেচনায় নিয়েছে। শুধু তাই নয়, তা অর্জনে যাতে কেউ প্রতারিত না হয় সে বিষয়ে কুরআনুল মাজীদে আলোকপাত করা হয়েছে–

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অবৈধ পন্থায় গ্রাস করো না এবং মানুষের ধন-সম্পত্তির কোনো অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশ্যে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না।"[৪৫]

সম্পদের পবিত্রতা অর্জন এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, কুরআনুল মাজীদে বার বার দৃষ্টি আকর্ষন করা হয়েছে। সূরা আল-বাক্বারাহ্তে উল্লেখ আছে–

﴿وَلَا تَأْكُلُوْا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ﴾

"তোমরা নিজেদের মধ্যে একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না। এমনকি সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে চাতুর্যের লেশমাত্র যাতে না থাকে সেজন্য মানুষের ধন-সম্পদের কোনো অংশ জেনেশুনে অন্যায়ভাবে গ্রাস করার উদ্দেশে তা বিচারকদের কাছে পেশ করো না।"[৪৬]

এই আয়াতগুলো স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, উপার্জনের পদ্ধতি এবং মাধ্যম অবশ্যই বৈধ হতে হবে, অন্যথায় তা হবে বড় যুল্ম, যার পরিণতি ভয়াবহ। তাই প্রত্যেক মুসলমানের উচিত উপার্জনের ক্ষেত্রে এই দু'টি মূলনীতির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা এবং তা অনুসরণ করা।

আল্লামা রশিদ রেজা, আধুনিক জগতের একজন খ্যাতিমান মুফাস্সির। তিনি তার তাফসীর গ্রন্থে 'হালাল' ও 'তাইয়্যিব' শব্দ দু'টো ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, কোনো বস্তু যখন 'তাইয়্যিব' বা উত্তম হয়, তার মানে হলো সেটি অন্যের অধিকার লঙ্ঘন করছে না। কুরআনে যেসব বস্তুর জন্য 'হারাম' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে, তা মূলত নিষিদ্ধ এবং অত্যন্ত নিরূপায় অবস্থায় তার ব্যবহার বৈধ হতে পারে। তাছাড়া এমনকিছু বস্তু রয়েছে যা মূলত হারাম নয়, তবে কোনো বিশেষ কারণে তাদের ব্যবহার হারাম হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এসব বস্তুসমূহের বিপরীতে 'তাইয়্যিব' বা উত্তম শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব, যেসব বস্তু অন্যায়ভাবে উপার্জিত, যেমন- সূদ, ঘুষ, জুয়া, চুরি, ছিনতাই, রাহাজানি, ধোঁকা, প্রতারণা, আমানতের খিয়ানত ইত্যাদি স্পষ্ট হারাম। অর্থাৎ- এগুলো তাইয়্যিব বা উত্তম নয়। সার্বিকভাবে প্রতিটি অপবিত্র বস্তুই হারাম, তা মূলগত কারণে হোক কিংবা অন্যকোনো কারণেই হোক।

সংসারজীবন নির্বাহের জন্য উপার্জনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। অনুরূপভাবে উপার্জিত সম্পদ যাতে করে হালাল বা বৈধ হয় সেদিকে খেয়াল রাখা প্রয়োজন। ইসলাম মানুষের জন্য জীবন যাত্রাকে সহজ, সুস্পষ্ট এবং পবিত্র করার জন্য সঠিক ও বৈজ্ঞানিক নির্দেশনা দিয়েছে। যে কারণে ইসলামের নির্দেশনার বাইরে যা কিছু উপার্জন করা হয় তা হারাম এবং অবৈধ হিসেবে গণ্য।

জীবিকার্জনের ধরন নিয়ে ইমাম আহম্মদ বিন হাম্বলের উক্তি প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন, হারামবস্তু পরিত্যাগ করা হলো সাধারণ মানুষের যহুদ বা পরহেযগারিতা। আর প্রয়োজনের অতিরিক্ত হালাল বস্তু পরিত্যাগ করা হলো বিশেষ ব্যক্তির যহুদ। অর্থাৎ- এই দু'টির মাঝে অবস্থান করে পারলৌকিক কল্যাণ অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া মু'মিনদের সিফাত। *[চলবে ইন্শাআল্লাহ]*

[৪৩] সূরা আন্-নিসা : ২৯।
[৪৪] সূরা আন্-নিসা : ২৯ (শেষাংশ)।
[৪৫] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৮৮।
[৪৬] সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ১৮৮।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

নববী দু'আ : এক অনন্য সৌভাগ্যের পরশ

–মো.খশিউর রহমান বিন মো.মনসুর আলী★

[প্রথম পর্ব]

স্মৃতির পাতা উল্টালে এখনো মনে পড়ে, আমি যখন মাদ্‌রাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাতে অধ্যয়ন করছিলাম, সে সময় শাঈখ আসাদুল্লাহ খান গালিব মাদিনী (হাফিযাহুল্লাহ)'র পরামর্শক্রমে লেখায় আগ্রহী হলে তখন থেকেই আমার লেখা সাপ্তাহিক আরাফাতে প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল। পরবর্তীতে বহুবার ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত লিখতে পারিনি। তবে আলহামদুলিল্লাহ, মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে আজ আবারও কলম হাতে নিতে পেরেছি। এই লেখাটি আপনাদের খেদমতে নিবেদন করার মনস্থ করেছি। ইন্‌শাআল্লাহ, ভবিষ্যতে আরো একটি লেখা "মমতার মুকুট" শিরোনামে প্রকাশিত হবে।

আপনার সরল হৃদয় আর চিন্তাশীল মনকে একবার ভাবনায় আনুন তো, নবীকুলের শিরোমণি, রহমাতুল্লিল 'আলামীন, জগতের শ্রেষ্ঠ মানব মুহাম্মাদুর রাসূল (ﷺ) তাঁর যমযমে ধোয়া পবিত্র অন্তর থেকে যদি আপনার জন্য দু'আ করেন!

তিনি যদি তাঁর একমাত্র রব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দরবারে আপনার মাগফিরাত চান, আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি কামনা করেন। তাহলে এর চেয়ে বড় প্রাপ্তি জীবনে আর কি হতে পারে?

যদি তিনি আপনার জন্য বলেন "হে আল্লাহ! তুমি এ মানুষটিকে ভালোবাসো" তাহলে পৃথিবীতে আপনার চেয়ে সৌভাগ্যবান আর কি কেউ থাকতে পারে?

সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে অনেকে ছিলেন, যারা নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর যবান থেকে এমন দু'আ পেয়ে ধন্য হয়েছেন। নববী দু'আর বরকতে তাঁদের জীবন হয়েছে অপরূপ, চমৎকার এবং বিস্ময়করভাবে সুন্দর। যারা দু'আ পেয়েছেন, তাঁরা বাস্তব জীবনে সেই দু'আর প্রতিফলন স্পষ্টভাবে দেখেছেন। আর সেটিই ছিল রাসূল মুহাম্মদ (ﷺ)-এর মু'জিযার উজ্জ্বল সাক্ষ্য।

আজকের আলোচনায় আমরা এমন কয়েকজন সাহাবীর কথা জানব, যারা নববী দু'আতে ধন্য হয়েছেন সাথে সাথে জানবো নবী (ﷺ) ব্যক্তিগতভাবে যাদের জন্য দু'আ করেছেন,

★প্রাক্তন শিক্ষার্থী, মাদ্‌রাসাতুল হুদা আল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, ঠাকুরগাঁও।

১. আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে সঙ্গে নিয়ে গার সাওর-এর দিকে রওনা হলেন। এ গার মক্কা মুকার্‌রমার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রায় তিন মাইল দূরে অবস্থিত। যখন তাঁরা গারে পৌঁছালেন, তখন আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবীজি (ﷺ)-কে বললেন,

আপনি কিছুক্ষণ স্থির থাকুন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার জন্য গারটি আগে পরীক্ষা করে দেখি।

আবার ঐদিকে যখন মুশরিকরা জানতে পারল যে, রাসূল (ﷺ) ও আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বের হয়ে গেছেন, তখন তারা সর্বত্র তাঁদের খোঁজ করতে লাগল এবং ঘোষণা দিলো যে, যে তাঁদের ধরে আনবে তাকে একশত উট পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা গারের দরজার পাশ দিয়েও গেল, কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করল না। কারণ তারা গারের মুখে মাকড়সার জাল দেখতে পেলো, আর দেখল দু'টি কবুতর সেখানে বাসা বেঁধেছে।[৪৭]

এদিকে আবূ বক্‌র সিদ্দীক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) শত্রুদের দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে নবীজি (ﷺ)-এর জন্য ভয় অনুভব করছিলেন। কিন্তু নবীজি (ﷺ) তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন,

«لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا».

"ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন।"[৪৮]

সকাল হলে নবীজি (ﷺ) আবূ বক্‌র (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, তোমার কাপড় কোথায়? তিনি জানালেন যে, তিনি কাপড় ছিঁড়ে পাথরের ফোঁকরে গুঁজে দিয়েছিলেন। তখন নবীজি (ﷺ) তাঁর হাত উঠিয়ে দু'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اجعل أبا بكر في درجتي في الجنة.

"হে আল্লাহ! আবূ বক্‌রকে জান্নাতে আমার সঙ্গী এবং আমার মর্যাদার সমান করে দাও।"[৪৯]

২. 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : ইসলামগ্রহণের পূর্বে 'উমার ইসলামের ঘোর শত্রু ছিল। এমনকি তিনি রাসূল (ﷺ)-কে হত্যা করার জন্য উন্মুক্ত তলোয়ার নিয়ে বের হয়েছিল। আবূ জাহলের মতো ক্ষমতাধর ছিল সে। বোন ও ভগ্নিপতির ইসলাম কবুলের কথা শুনে সে ছুটে গিয়ে তাঁদের আঘাতও করেছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি ইসলামের গণ্ডি হতে। সবশেষে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিতে হয়েছিল কৃষমতাধর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে। এটিও ছিল কেবল মোহাম্মদ (ﷺ)-এর দু'আর ফসল।[৫০]

[৪৭] *সীরাত ইবনে হিশাম- সিফাতুস সফওয়া।*
[৪৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৬১৫।*
[৪৯] *য'ঈফ, মাওযূ'।*
[৫০] *আর-রাহীকুল মাখতুম- সমকালীন প্রকাশনী, পৃ. ১৫৮; তারিখু 'উমার ইবনুল খাত্ত্বাব- পৃ. ৭, ১০, ১১।*

কিন্তু পরবর্তীতে তিনি রাসূল (ﷺ)-এর কাছে এসে মুসলিম হয়ে জীবনকে আলোর সাজে সজ্জিত করেন। তাঁর এই ইসলাম গ্রহণ ও ইসলামের একজন কিংবদন্তি ব্যক্তি হওয়ার পিছনে ছিল রাসূল (ﷺ)-এর দু'আ। তিনি দু'আতে বলেছিলেন,

اَللّٰهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ.

হে আল্লাহ! আবূ জাহল আর 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)'র মধ্যে যে তোমার কাছে প্রিয়, তাঁর দ্বারা তুমি ইসলামকে শক্তিশালী করো।[৫১]

আল্লাহ তা'আলা তাঁর দ্বীনের জন্য 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বেছে নিয়েছিলেন। 'উমার ইসলামের জন্য হয়ে উঠেছিলেন শক্ত মজবুত প্রাচীরের মতো। আল্লাহ তা'আলা তাঁর যবানে ও অন্তরে হক্ব প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলেন। ইবনু মাস'ঊদ তাঁর ব্যাপারে বলেন, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ইসলাম গ্রহণ ছিল বিজয়, হিজরত ছিল সহায়তা আর খেলাফত ছিল রহমত'।[৫২] নববী দু'আর বারাকাতে তাঁর দ্বারা ইসলাম সর্বদা আগে বাড়তে থেকেছে।

৩. 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : ইমাম আত্ তিরমিযী 'আব্দুর রহমান ইবনু খাব্বাব আস-সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র থেকে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একদিন খুতবাহ্ দিলেন এবং মানুষকে জায়শুল উসরাহ (তাবুক যুদ্ধের সেনা)-এর জন্য দান করতে উৎসাহিত করলেন। তখন 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দাঁড়িয়ে বললেন,

عَلَيَّ مِائَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا.

"আমি একশো উট দিচ্ছি, সম্পূর্ণ সাজসরঞ্জামসহ।"[৫৩]

এরপর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আবার সাহাবীদের উৎসাহিত করলেন। তখন 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আবার দাঁড়িয়ে বললেন,

عَلَيَّ مِائَةُ بَعِيرٍ بِأَحْلَاسِهَا وَأَقْتَابِهَا.

"আমি আরো একশো উট দিচ্ছি, পূর্ণ সাজসরঞ্জামসহ।"[৫৪]

'আব্দুর রহমান আস-সুলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আমি দেখলাম, নবী মুহাম্মদ (ﷺ) হাত নাড়িয়ে বলছেন,

«مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ».

'আজকের পর 'উসমান যা-ই করুক না কেন, তার কোনো ক্ষতি হবে না।'[৫৫]

আরেক বর্ণনায়, হাকিম আন নাইসাবুরি 'আব্দুর রহমান ইবনু সামুরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নবী (ﷺ)-এর কাছে এক হাজার দিনার নিয়ে এলেন, যখন তিনি জায়সুল উসরাহ (তাবুক যুদ্ধের) সেনাদল প্রস্তুত করছিলেন। তিনি সেই দিনারগুলো রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর কোলে ঢেলে দিলেন। রাসূল (ﷺ) সেগুলো হাত দিয়ে উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলেন এবং বললেন,

«مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ اليَوْمِ».

"আজকের পর 'উসমান যা-ই করুক, তার কোনো ক্ষতি হবে না।"[৫৬] এ কথাটি তিনি দু'বার বললেন।

আবূ নু'আইম তাঁর হিলইয়াতুল আউলিয়া গ্রন্থে 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র সূত্রে বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাবুক যুদ্ধে 'উসমান ইবনু আফফান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বারবার আসা-যাওয়া করতে দেখে বললেন,

اللّٰهُمَّ اغفر لِعُثْمَانَ مَا أَقْبَلَ وَمَا أَدْبَرَ، وما أخفى وما أعلن، وما أسرَّ وما أجهر.

হে আল্লাহ! 'উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র জন্য ক্ষমা করুন। তাঁর অতীত ও ভবিষ্যৎ, প্রকাশ্য ও গোপন, আভ্যন্তরীণ ও প্রকাশ্য সবকিছুর জন্য।

৪. 'আলী ইবনু আবী তালেব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র অনুভূতি ছিল খুবই আশ্চর্যজনক। তাঁর শরীরে ঠাণ্ডা, গরমের কোনো প্রভাব পড়ত না। অসহ্য গরম তাঁকে ঘামাতে পারত না। জ্বলন্ত রোদ তাঁকে পুড়াতে পারত না। হাড় কাঁপানো শীত তাঁকে স্পর্শ করতে পারত না। যার শীত নেই, নেই গরমের আতিশয্য। যার অনুভব সবসময় নাতিশীতষ্ণ। প্রচণ্ড গরমে তিনি শীতের মোটা পোশাক পরতেন আর মাঘের শীতে তিনি গরমের পাতলা পোশাক পরতেন। তাঁর কাছে এই অদ্ভুত ক্ষমতার রহস্য জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, 'একবার আমার চোখ উঠেছিল। রাসূল (ﷺ) চোখে একটু থু থু ছিটিয়ে দিয়ে চোখ খুলতে বললেন। চোখ খোলার পর থেকে অদ্যাবধি আর কখনো সেখানে ব্যথা অনুভব করিনি। এরপর রাসূল (ﷺ) আমার জন্য দু'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ الحَرَّ وَالْبَرْدَ.

হে আল্লাহ! 'আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে গরম ও ঠাণ্ডা থেকে নিরাপদে রাখো। এই দু'আর পর থেকে আর কখনো আমি ঠাণ্ডা, গরম অনুভব করিনি।[৫৭]

---

[৫১] আহমাদ- হা. ৫৬৯৬; আত্ তিরমিযী- হা. ৩৬৮১, সহীহ।
[৫২] তারীখু দেমাশক- ইবনু আসাকির, পৃ. ৪২।
[৫৩] মুসনাদ আহমাদ- ১৬৬৯৬; আত্ তিরমিযী- ৩৭০০, য'ঈফ।
[৫৪] আহমাদ- ১৬৬৯৬; জামে' আত্ তিরমিযী- ৩৭০০, য'ঈফ।
[৫৫] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৭০১, হাসান।
[৫৬] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৭০১, হাসান।
[৫৭] ইবনু মাজাহ্- হা. ১১৭; মুসনাদ আহমাদ- হা. ৭৭৮, হাসান।

সূচীপত্র

৫. 'আয়িশাহ্ বিনতু আবী বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহা) : একদা রাসূল (ﷺ) প্রফুল্ল মনে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র কাছে ছিলেন। এমন এক অন্তরঙ্গ সময়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁর এই খুশি মন দেখে নম্র অনুরোধে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ)! আমার জন্য একটু দু'আ করুন'। রাসূল (ﷺ) এভাবে দু'আ করলেন,

اَللّٰهُمَّ اغفر لِعَائِشَةَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهَا وَمَا تَأَخَّرَ، مَا أَسَرَّتْ وَمَا أَعْلَنَتْ.

হে আল্লাহ, 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা)'র পূর্বের ও পরের সব গুনাহ মোচন করে দাও। সে প্রকাশ্যে কিংবা গোপনে যা করেছে, সব তুমি ক্ষমা করে দাও।

প্রিয়তম স্বামী ও জগতের সর্বোত্তম মানবের কাছ থেকে এমন সুন্দর দু'আ পেয়ে 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) আনন্দে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে তাঁর মাথা রাসূল (ﷺ)-এর মমতাময় কোলে জায়গা করে নিলো। রাসূল (ﷺ) বললেন, 'আমার এই দু'আর কারণেই কি তুমি এত খুশি হয়েছ?' 'আয়িশাহ্ (ﷺ) বললেন, 'এমন দু'আ পেয়ে খুশি না হয়ে থাকা যায়'। উম্মতপ্রেমী রাসূল (ﷺ) তখন বললেন,

وَاللهِ إِنَّهَا لَدَعَائِي لأمي في كل صلاة.

আমার উম্মতের জন্য প্রত্যেক সলাতে আমি এই দু'আ করি।[৫৮]

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তিনি শুধু তাঁর নিজের জন্যই দু'আ করেছেন এমনটি নয়; বরং তিনি তার উম্মতের জন্য প্রতিনিয়তই দু'আ করতেন। তার দু'আর মাঝে শামিল রাখতেন। যা উক্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। তিনি সর্বদাই চিন্তিত থাকতেন তার উম্মতকে কিভাবে সঠিক পথে পরিচালিত করা যায়।

৬. 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তার সন্তানদের জন্য– 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-কে বললেন, আগামী সোমবার প্রভাতে আপনি আমার কাছে আসবেন এবং আপনার সন্তানদেরকেও সাথে নিয়ে আসবেন। আপনার জন্য এবং আপনার সন্তানদের জন্য আমি একটি দু'আ করব, যার পরিপ্রেক্ষিতে আল্লাহ তা'আলা আপনাকেও উপকৃত করবেন এবং আপনার সন্তানদেরকেও।

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, প্রভাতে তিনি গেলেন এবং তার সঙ্গে আমরাও গেলাম। রাসূল (ﷺ) আমাদের শরীরে একখানা চাদর জড়িয়ে দিয়ে বললেন,

«اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَّاسِ وَوَلَدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تُغَادِرُ ذَنْبًا، اللّٰهُمَّ احْفَظْهُ فِيْ وَلَدِهِ».

"হে আল্লাহ! 'আব্বাস ও তার সন্তানদের বাহির ও ভিতর উভয় দিক এমনভাবে ক্ষমা করে দিন যার পর তাদের আর কোনো অপরাধ বাকি না থাকে। হে আল্লাহ! তাকে তার সন্তানদের ব্যাপারে হিফাযাত করুন"।[৫৯]

৭. 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) : উম্মুল মু'মিনীন মায়মুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) সম্পর্কে, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-এর খালা ছিলেন। একদা রাসূল (ﷺ) মায়মুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু)'র ঘরে অবস্থান করছিলেন। সে সময় সেখানে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু)-ও ছিলেন। রাসূল (ﷺ) ওযূ করতে গেলে 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তাঁর জন্য ওযূর পানি রেখে দেন। রাসূল (ﷺ) পানি দেখে জিজ্ঞেস করেন, ওযূর পানি কে এনে দিলো?

মায়মুনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস আপনার জন্য এই পানি রেখেছে'। রাসূল (ﷺ) তখন তাঁর কাঁধে হাত রেখে দু'আ দিয়ে বললেন,

اَللّٰهُمَّ فَقِّهْهُ فِيْ الدِّيْنِ وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيْلَ.

হে আল্লাহ! তাঁকে দ্বীনের গভীর জ্ঞান দান করো এবং তাফসীর (ব্যাখ্যা)-এর জ্ঞান প্রদান করো।[৬০]

অন্য রিওয়ায়েতে ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নবী (ﷺ) আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং বললেন,

عَلِّمْ الحِكْمَةَ. হে আল্লাহ! তাঁকে হিকমাহ তথা জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি শিক্ষা দাও।[৬১]

রাসূল (ﷺ)-এর এই দু'আর বরকতে তিনি হয়ে উঠেন 'রাইসুল মুফাস্‌সিরীন' তথা 'কুরআন ব্যাখ্যাকারকদের মুকুট'।

তাঁকে বলা হতো 'হাবরুল উম্মাহ' তথা 'উম্মাহর পণ্ডিত'। তিনি রাসূল (ﷺ) থেকে অনেক বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন, যার সংখ্যা প্রায় ১৬৬০টি। শ্রেষ্ঠ সাহাবী 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) পর্যন্ত বড় কোনো মাসআলাতে তাঁর শরণাপন্ন হতেন।

'আব্দুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) "হাবরুল উম্মাহ" ও "রইসুল মুফাস্‌সিরিন" হওয়ার পিছনে যে রহস্য রয়েছে সেটি হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর দু'আর বরকত। দু'আ বৈ কিছু নয়। ☒

[৫৮] *ইবনু হিব্বান- হা. ৭১১১; হাকিম- হা. ৬৭৩৮; মাজমাউল যাওয়ায়েদ- ৯/২৪৬, হাসান।*

[৫৯] *জামে' আত্ তিরমিজী- হা. ৩৭৬২।*

[৬০] *মুসনাদে আহমাদ- হা. ২৩৯৭, সহীহ।*

[৬১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৫৪৬।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

–মুহাম্মদ সাকিব

মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের প্রয়োজনীয়তা : একজন মুসলিমের জীবনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হলো মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা। আর এই সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে তাঁরই উদ্দেশ্যে, তাঁরই দেখানো পথে, তাঁরই নির্দেশিত 'ইবাদত ও ভালো কাজের মাধ্যমে তাঁর নৈকট্য লাভ করা। এর জন্য প্রয়োজন 'ইবাদতের পাশাপাশি তথা সকল ভালো কাজ ও দুনিয়াবী কাজেও মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির প্রত্যাশায় নিয়োজিত থাকা। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যমেই সবকিছু অর্জন করা সহজ হয়। আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করাও এর অন্তর্ভুক্ত যা মু'মিন মাত্রই অপরিহার্য। আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿وَ هٰذَا كِتٰبٌ اَنۡزَلۡنٰهُ مُبٰرَكٌ فَاتَّبِعُوۡهُ...﴾

"আর এই কুরআন একটি বারাকাতময় কিতাব, আমি এটি নাযিল করেছি; সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ করো...।"[৬২] আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿مَنۡ يُّطِعِ الرَّسُوۡلَ فَقَدۡ اَطَاعَ اللّٰهَ...﴾

"যে ব্যক্তি রাসূলের আনুগত্য করে, সে আল্লাহরই আনুগত্য করে...।"[৬৩]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা এগুলো আঁকড়ে ধরবে, কখনো পথভ্রষ্ট হবে না– মহান আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ।"[৬৪]

আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اَفَحُكۡمَ الۡجَاهِلِيَّةِ يَبۡغُوۡنَ ؕ وَ مَنۡ اَحۡسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكۡمًا لِّقَوۡمٍ يُّوۡقِنُوۡنَ﴾

"তারা কি জাহিলী যুগের আইন বিধান চায়? দৃঢ় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আইন-বিধান প্রদানে আল্লাহ হতে কে বেশি শ্রেষ্ঠ?"[৬৫]

[৬২] *সূরা আল-আন্'আম : ১৫৫।*
[৬৩] *সূরা আন্-নিসা : ৮০।*
[৬৪] *মুওয়াত্ত্বা মালিক- হা. ১৫৯৪, সহীহ।*
[৬৫] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৫০।*

এখানে স্পষ্ট যে, কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ ব্যতীত বিকল্প কোনো পন্থা বা রাস্তা নেই। এখন আমরা যদি কুরআন ও হাদীসের অনুসরণ করি, তাহলে কি পাব?

নির্দ্বিধায় মহান আল্লাহর অনুসরণের বিনিময়প্রাপ্ত হওয়া প্রসঙ্গে : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلۡ اِنۡ كُنۡتُمۡ تُحِبُّوۡنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوۡنِیۡ يُحۡبِبۡكُمُ اللّٰهُ وَ يَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوۡبَكُمۡ...﴾

"বলুন, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাসো, তবে আমাকে অনুসরণ করো; আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ মাফ করবেন...।"[৬৬]

হুনায়নের যুদ্ধের পর আল্লাহর রাসূল (ﷺ) গনীমাতের মাল বণ্টন করলেন। বিভিন্ন গোত্রপতি ও দেরিতে ইসলাম গ্রহণকারী আরবদেরকে তিনি গনীমাতের মাল বণ্টন করে দিলেন। তিনি আনসারদের তুষ্টি ও ঈমানের প্রতি আশ্বস্ত হয়ে তাদেরকে গনীমাতের মাল দিলেন না। সম্ভবত তাদের কেউ কেউ এ বণ্টন থেকে তাদের বাদ পড়ার কারণ পুরোপুরি বুঝতে পারেনি, তাই আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাদেরকে বাদ দেয়ার কারণ তাদের নিকট ব্যাখ্যা করার প্রতি তার ভালোবাসার কথা জানিয়ে বললেন যে, ইসলামের নিকটবর্তী করার জন্যই শুধুমাত্র তিনি অন্যদেরকে (গনীমাতের সব মাল) দিয়েছেন, তাদের ঈমানের দুর্বলতার কারণেই এ কাজ করা হয়েছে, তাদের ঈমানকে শক্তিশালী করার প্রয়োজন ছিল। তিনি আনসারদেরকে বললেন : "যখন নাকি লোকেরা উট ও ভেড়া নিয়ে চলে যাচ্ছে তখন তোমরা মহান আল্লাহর রাসূলকে নিয়ে যাচ্ছ এতে কি তোমরা সন্তুষ্ট নও।" আনসারগণ আমার অন্তর্বাসের (গেঞ্জি ইত্যাদির) মতো আর অন্যরা আমার বহির্বাসের (কোর্তা ইত্যাদির) মতো (অর্থাৎ- মর্যাদাসম্পন্ন)। তখন তারা সন্তুষ্ট হলো, তাদের ওপর আনন্দ ও প্রশান্তি নেমে আসলো। অধিকন্তু আল্লাহ ও তার রাসূল (ﷺ) তাদের ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গেলেন। যারা সত্যিকার অর্থে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় তারা এমনকি গোটা দুনিয়ার বিনিময়েও এ সন্তুষ্টিকে বিক্রি (বিলীন) করে দিবে না। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির পুরস্কারের সাথে কোনো কিছুরই তুলনা হয় না।[৬৭]

[৬৬] *সূরা আ-লি-'ইমরা-ন : ৩১।*
[৬৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৩৯/১০৬১।*

যারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টির চেষ্টায় তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে তারা বিপথগামী : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ اتۡلُ عَلَیۡهِمۡ نَبَاَ الَّذِیۡۤ اٰتَیۡنٰهُ اٰیٰتِنَا فَانۡسَلَخَ مِنۡهَا فَاَتۡبَعَهُ الشَّیۡطٰنُ فَکَانَ مِنَ الۡغٰوِیۡنَ﴾

"তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ (নিদর্শনাবলি) দিয়েছিলাম, কিন্তু সে সেগুলো থেকে দূরে সরে যায় (ওগুলোকে দূরে নিক্ষেপ করে), তাই শয়তান তার পিছু নেয়, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।"[৬৮]

তাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের যথাযথ অনুসরণ করতে হবে– আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿یٰۤاَیُّهَا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوا ادۡخُلُوۡا فِی السِّلۡمِ کَآفَّۃً ۪ وَّ لَا تَتَّبِعُوۡا خُطُوٰتِ الشَّیۡطٰنِ...﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা ইসলাম ধর্মে পূর্ণভাবে প্রবেশ করো এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না...।"[৬৯]

ইমাম আত্ তিরমিযী (রাহিমাহুল্লাহ) 'হাসান সহীহ' বলে বর্ণনা করেছেন যে, 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) মাক্কায় হজ্জ করতে যাওয়ার জন্য নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর অনুমতি নিতে গেলেন। আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উত্তর দিলেন, "হে আমার ভাই! তোমার প্রার্থনায় আমাদেরকে ভুলে যেও না।"[৭০]

কল্পনা করা যায় যে, আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আপনাকে বলেছেন, "হে আমার ভাই! তোমার দু'আয় আমাদেরকে ভুলে যেও না যেন, তখন আপনার কেমন লাগবে?"

আল্লাহর নিকট নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সন্তুষ্টির ও আনন্দের মাত্রার স্তর বর্ণনা করা আমাদের সাধ্যাতীত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) স্বচ্ছলতার সময় ও দারিদ্রতার সময়, সুস্থতার সময় ও অসুস্থতার সময় এবং সুখে ও দুঃখে বা দুঃসময়ে ও সুসময়ে তার প্রতিপালকের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

এজন্য মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে স্বীকৃতি দিতে হবে এভাবে– আল্লাহ রব্বুল 'আলামীন বলেন :

﴿قُلۡ اِنَّ صَلَاتِیۡ وَ نُسُکِیۡ وَ مَحۡیَایَ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ﴾

"বলুন, আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু সবই আল্লাহর জন্য- যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।"[৭১]

[৬৮] *সূরা আল-আ'রাফ : ১৭৫।*
[৬৯] *সূরা আল-বাক্বারাহ্ : ২০৮।*
[৭০] *জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ৩৫৬২, আলবানী য'ঈফ।*
[৭১] *সূরা আল-আন্'আম : ১৬২।*

অতএব একজন মু'মিনের জীবনের প্রতিটি কাজের মূল উদ্দেশ্য হতে হবে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন; এতে কোনো প্রকার দ্বিধা, সন্দেহ বা অবহেলার কোনো সুযোগ নেই।

ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজ করা কতটুকু প্রয়োজন?

ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা বলতে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক প্রেরিত ইসলামের মূল বিশ্বাস, বিধান ও নৈতিকতাকে সমাজে ছড়িয়ে দেয়া এবং এর ভিত্তিতে একটি সুশৃঙ্খল সমাজ গঠন করা বুঝায়, যার মাধ্যমে মানুষ ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি লাভ করতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿اِنَّ الدِّیۡنَ عِنۡدَ اللّٰهِ الۡاِسۡلَامُ﴾

"নিশ্চয় একমাত্র গ্রহণযোগ্য দীন (জীবনব্যবস্থা) হলো ইসলাম।"[৭২]

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন :

﴿وَ مَنۡ یَّبۡتَغِ غَیۡرَ الۡاِسۡلَامِ دِیۡنًا فَلَنۡ یُّقۡبَلَ مِنۡهُ...﴾

"যে কেউ ইসলামের বাইরে অন্য কোনো দীন চায়, তা কখনো কবুল হবে না...।"[৭৩]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন : "যে ব্যক্তি এমন কোনো কাজ করবে যা আমাদের শারী'আতের (ইসলামের) অংশ নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।"[৭৪]

এই আয়াতসমূহ হতে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, মহান আল্লাহর এই সুন্দর ভুবনে ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির দিক নির্দেশনা সম্বলিত স্বভাব ও শান্তির গ্যারান্টিযুক্ত একমাত্র জীবন ব্যবস্থা "ইসলাম"।

ইসলামের প্রচার-প্রতিষ্ঠা– ইসলাম প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে দলবদ্ধতার তাগিদ : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَ لۡتَکُنۡ مِّنۡکُمۡ اُمَّۃٌ یَّدۡعُوۡنَ اِلَی الۡخَیۡرِ وَ یَاۡمُرُوۡنَ بِالۡمَعۡرُوۡفِ وَ یَنۡهَوۡنَ عَنِ الۡمُنۡکَرِ ؕ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الۡمُفۡلِحُوۡنَ﴾

"তোমাদের মধ্যে একটি দল থাকা উচিত যারা মানুষের কাছে সৎকাজের দা'ওয়াত দিবে, অসৎকাজ থেকে নিবৃত্ত করবে- তারাই সফলকাম।"[৭৫]

[৭২] *সূরা আ-লি-'ইমরা-ন : ১৯।*
[৭৩] *সূরা আ-লি-'ইমরা-ন : ৮৫।*
[৭৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৮।*
[৭৫] *সূরা আ-লি-'ইমরা-ন : ১০৪।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

এই আয়াতে স্পষ্ট নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, ইসলামী সংগঠন থাকা আবশ্যক, যারা সমাজে দীন প্রতিষ্ঠার কাজ করবে। আর যদি দীন প্রতিষ্ঠার জন্য সাধ্যানুযায়ী চেষ্টা না করে, তাহলে শাসকের দায়ভারও আমাদের ওপর পড়বে। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন :

﴿...وَمَنْ لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ﴾

"...যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী শাসন করে না, তারা সত্যিকার অর্থে কাফির।"[৭৬]

এজন্যই রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : "আমার পক্ষ থেকে এক আয়াত হলেও পৌঁছে দাও...।"[৭৭]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেছেন : 'যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ তা'আলা একজন ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে সেটি তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চেয়েও উত্তম হবে।'[৭৮]

সাহ্ল ইবনু সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন : 'একদিন মহান আল্লাহর পথে সময় ব্যয় করা অথবা প্রস্তুত থাকা পৃথিবী এবং তার ওপর যা কিছু আছে সব কিছুর চেয়েও উত্তম।'[৭৯]

অতএব মানব জীবনের প্রকৃত বা একমাত্র লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হওয়া উচিত মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন। আর মহান আল্লাহর সন্তুষ্টিই একমাত্র মুক্তির পথ। মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ করা অপরিহার্য। 'ইবাদত, লেনদেন, সামাজিক, রাজনৈতিক, পারিবারিক– সবক্ষেত্রে ইসলামী নির্দেশনা মানতে হবে। শুধু নিজে 'আমল করাই নয় বা শুধু ব্যক্তিগত 'আমল নয়; বরং ইসলামের দা'ওয়াহ্ ও প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করা আমাদের ফারযিয়াত দায়িত্ব। তাই যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর পথে চেষ্টা করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে দুনিয়া ও আখিরাতে সফলতা দান করবেন।

অতএব, আল্লাহ তা'আলা আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করার এবং ইসলামের দা'ওয়াহ্ ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করার তাওফীক্ব দিন –আমীন। ☒

---

[৭৬] *সূরা আল-মায়িদাহ্ : ৪৪।*
[৭৭] *বুখারী- হা. ৩৪৬১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৯৮।*
[৭৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৭০১।*
[৭৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৮৯২; মিশকাত- হা. ৩৭৯১।*

জুলকারনাইন ও তার নির্মিত দেয়াল

[২৪ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

ধারণা করা হয় এই জাতি ধাতুর ব্যবহার জানত। তারা হাপর বা ফুঁক নল দ্বারা বায়ু প্রবাহ চালনা করে ধাতুকে উত্তপ্ত করে গলাতে পারত এবং তারা লোহার পিণ্ড ও গলিত তামাও তৈরি করতে পারত। জুলকারনাইন তাদের প্রতিরোধ প্রাচীর তৈরি করার জন্য উপাদান ও শ্রম সরবরাহ করতে বললেন। তারা নিজেরাই জুলকারনাইনের আদেশ মতো দুই পর্বতের মাঝে শক্ত লোহার প্রাচীর বা দ্বার তৈরি করলো। আধুনিক যুগের গবেষক ও পণ্ডিতদের মতে, কুরআনে উল্লিখিত জুলকারনাইনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক সম্ভাব্য ৩টি চরিত্র নির্দেশ করা হতে পারে। তারা হলেন– আলেকজান্ডার, সাইরাস দি গ্রেট এবং হিমায়ার সাম্রাজ্যের একজন শাসক।

জুলকারনাইনের প্রাচীরটির সঠিক অবস্থান জানা যায়নি। এ সম্পর্কে নানা মতবাদ প্রচলিত। একটি মতবাদ অনুসারে, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী অরুণাচলে, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেখানে ইয়াজুজ, মাজুজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন জুলকারনাইন। আর সে স্থানটি পাহাড়ের প্রাচীরের মাঝখানে। এই বর্ণনার সাথে মিলে যায় এমন একটি দেয়াল রয়েছে কাসপিয়ান সাগর উপকূলে।

ইতিহাসবিদদের দ্বারা স্বীকৃত যে এ দেয়াল তৈরি করেছিলেন আলেকজান্ডার। যা তৈরি করতে লোহা ও তামা ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে একটি তোরণ রয়েছে যেটি 'কাসপিয়ান গেট' বা আলেকজান্ডারের গেট নামে পরিচিত। দারিয়াল এবং দারবেন্ত নামে দু'টি শহরে এর ব্যাপ্তি। দারিয়াল রাশিয়া এবং জর্জিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। এটিকে বলা হয় কাজবেক পাহাড়ের পূর্ব প্রান্তে। দারবেন্ত রাশিয়ার দক্ষিণে অবস্থিত একটি শহর। কাসপিয়ান সাগরের দক্ষিণপূর্ব উপকূলে নির্মিত এ দেয়ালটি তোলা হয়েছে দু'টি পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থানে। এ পাহাড় দু'টিকে বলা হয় পৃথিবীর উঠান। আলেকজান্ডার নির্মিত এ দেয়ালের উচ্চতা ২০ মিটার এবং এটি ৩ মিটার (১০ ফুট) পুরু।

মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল কারিমে জুলকারনাইন ইয়াজুজ মাজুজকে আটকানোর জন্য একটা দেয়াল নির্মাণ করেছিলেন। এটা কোথায় নির্মাণ করা হয়েছে বা এ সম্পর্কে আরো যে ঘটনাগুলো বর্ণিত হয়েছে সেগুলো সম্পর্কে কুরআন কিছু বলেনি। অতএব এ ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলায় অধিক ভালো জানেন। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মৃতের গোসল এবং কাফনের কাপড়

–জান্নাতুল মহল★

আল্লাহ তা'আলা তাঁর পবিত্র কুরআনে বলেন,

﴿هُوَ يُحْيِ وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾

অর্থ : "তিনি জীবন দান করেন, তিনিই মৃত্যু দেন, আর তাঁর দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।"[৮০]

অতএব, দুনিয়ার জীবন শেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। জন্ম হলে মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতিটি ব্যবস্থাপনা কুরআন ও সুন্নহার অনুসরণেই করতে হবে। অতএব, আসুন! কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জেনে নেই মৃতের গোসল কিভাবে করাবো ও কাফনের কাপড় কিভাবে পড়াবো।

সহীহুল বুখারী থেকে বর্ণিত, মৃত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব গোসল দেয়ার ব্যবস্থা করা ওয়াজিব। কারণ রাসূল (ﷺ) গোসল করানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করেছেন।

গোসল দেয়ার সময় নিম্নের বিষয়গুলোর ক্ষেত্রে বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে হবে– গোসলের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত ব্যক্তিই গোসল করানোর দায়িত্ব পালন করবে। আর তারা যদি পরিবার বা নিকটাত্মীয়দের মধ্য থেকে হয় তাহলে তাই উত্তম। কারণ রাসূল (ﷺ)-কে নিকটজনরাই গোসল করিয়ে ছিলেন। যুদ্ধের ময়দানে শাহাদাত বরণকারীকে গোসল করাতে হবে না যদিও সে নাপাকি অবস্থায় থাকে। *(এ মর্মে বুখারী; মুসলিম; আবূ দাউদ; আন্ নাসায়ী; আত্ তিরমিযী; ইবনু মাজাহ্; বাইহাক্বী; আহমাদ প্রমুখ মুহাদ্দিসগণ জানাযা অধ্যায়ে হাদীস বর্ণনা করেছেন।)*

এক নজরে সুন্নাহর আলোকে গোসল পদ্ধতি :

১. গোসলের প্রস্তুতী হিসাবে গোসলের আগেই কাফনের কাপড়, কর্পূর, তুলা, দস্তানা (কাফনের সাথে থাকে), আতর, কাঁচি, পুরানো শাড়ী বা নরম কাপড়, সাবান, বালতিতে কুসুম গরম পানি (বড়ই পাতা মিশ্রিত) ইত্যাদি গুছিয়ে নিতে হবে। তিনবার গোসলের জন্য তিন বালতি পানি, ৩টি মগ, সম্পূর্ণ শরীর ঢাকার জন্য বা গোসলের একটি নরম চাদর-গোসল শেষে ঢেকে দেয়ার জন্য আরো একটি চাদরসহ মোট ৩/৪টি চাদর। গোসল করানোর জন্য উঁচু টেবিল। কাফনের কাপড় পরানোর জন্য আরো একটি টেবিল বা খাটিয়া।

২. পুরুষের গোসল পুরুষেরা এবং মহিলাদের গোসল মহিলারাই করাবে। একই লিঙ্গের কাউকে পাওয়া না গেলে গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করাবে। বাচ্চাদের গোসল যে কেউ দিতে পারবে। 'আয়িশাহ্ (রযিয়াল্লা-হু আনহা) থেকে বর্ণিত, 'প্রয়োজনে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের গোসল করাতে পারবে'[৮১]। তাছাড়া 'আলী (রাযিয়াল্লা-হু আনহু) তাঁর স্ত্রী ফাতিমাকে মৃত্যুর পর গোসল দিয়েছিলেন[৮২]। এই হাদীস থেকে প্রমাণিত স্বামী বা স্ত্রীর মৃত্যুর পর জীবিত স্ত্রী স্বামীর এবং স্বামী স্ত্রীর মৃতদেহ দেখতে পারবে।

৩. মৃত ব্যক্তিকে তিনবার গোসল দিতে হবে। চাইলে আরো বেশিবার দেওয়া যাবে। গোসল দেওয়া বিজোড় হতে হবে। শেষবার কর্পূর মিশানো পানি দিয়ে গোসল দিতে হবে।

৪. গোসলের জন্য হালকা গরম পানিতে বড়ই পাতা মিলাতে হবে, যাতে পানির রঙ, স্বাদ বা গন্ধ বদলে না যায়। পানি কুসুম গরম হতে হবে। চুলা থেকে গরম পানি নামিয়ে বড়ই পাতা ধুয়ে গরম পানির ভিতর দিতে হবে।

৫. গোসল দানকারী হাতে দস্তানা পরবেন বা নরম কাপড় জড়িয়ে নিবেন। পায়ে স্যান্ডেল বা জুতা পরবেন। তার দৃষ্টি সংযত রাখবেন।

৬. একটি চৌকির উপর বা টেবিলের উপর লাশ রাখতে হবে। সব সময় লাশের সতর ঢাকা থাকবে।

৭. চাদর দিয়ে ঢাকা লাশের পরনের কাপড় সতর্কতার সাথে কাঁচি দিয়ে কেটে চাদরের তলা দিয়ে টেনে খুলে নিতে হবে।

৮. শরীর থেকে রক্তপাত হলে ক্ষতস্থানে তুলা ও ব্যান্ডেজের সাথে কর্পূর লাগিয়ে দিতে হবে।

৯. চাদরের নিচ দিয়ে দস্তানা পরা হাতে অথবা নরম পুরানা কাপড় দিয়ে পেঁচানো হাতে শরীরের নিচের অংশে ময়লা থাকলে তা পরিস্কার করে দিতে হবে। পরে পানি ঢেলে সাবান লাগিয়ে আরেকবার অন্য কাপড়ের টুকরা দিয়ে পরীস্কার করতে হবে। তারপরেও দেখতে হবে ময়লা আছে কি-না?

১০. পেট বা কোমরের নিচের অংশ পরিস্কারের পর মৃত ব্যক্তিকে সলাতের ওযূর ন্যায় ওযূ করাতে হবে। বিস্‌মিল্লা-হ বলে ওযূ শুরু করতে হবে। পবিত্রতার জন্য ওযূ বা গোসল করানো হচ্ছে, এমন নিয়ত মনে পোষণ করতে হবে। ডান দিক থেকে ওযূ শুরু করতে হবে। কুলি না করিয়ে ভেজা কাপড় বা তুলা দিয়ে দাঁত ও ঠোঁট পরিস্কার করে দিতে হবে। এইরূপ তিনবার করবে। অনুরূপভাবে নাকের দুই ছিদ্র পরিস্কার করবে। এটাও তিনবার তুলা দিয়ে করতে হবে। এরপর মুখ ধুয়ে দিতে হবে। পুরুষের ক্ষেত্রে দাড়ী ধুয়ে দিতে হবে। তারপর ডান ও পরে বাম হাত কনুই পর্যন্ত, এরপর মাথা মাসেহ করে ডান ও বাম পা ধুতে হবে।

★ *দাঈ' ও প্রশিক্ষক, ঢাকা হজ্জ ক্যাম্প।*

[৮০] *সূরা ইউনুস : ৫৬।*

[৮১] *সুনান ইবনু মাজাহ্; মুসনাদ আহমাদ ও অন্যান্য।*

[৮২] *বায়হাক্বী; দারাকুত্বনী।*

১১. মুর্দার নখ ও চুল কাটা যাবে না। নেল পালিশ থাকলে তুলে ফেলতে হবে। নখে ময়লা থাকলে কাঠি দিয়ে খিলাল করে পরিষ্কার করে দিতে হবে।

১২. শরীরে পানি ঢালার পূর্বে তুলা দিয়ে কান ও নাকের ফুটা বন্ধ করতে হবে যাতে ভেতরে পানি না ঢুকে যায়।

১৩. প্রথমেই মাথা ধুয়ে দিতে হবে। মৃত ব্যক্তির চুল খুলে দিতে হবে। চুলের খোঁপা খুলে তা ভালোভাবে সাবান বা শ্যাম্পু দিয়ে ধুতে হবে।

১৪. ডান দিক থেকে শুরু করে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত সাবান দিয়ে সারা শরীর ধুতে হবে। ধোয়ার সময় লাশকে বাম কাত করে ডান দিকের কাঁধ থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত পানি ঢেলে এমনভাবে ধুতে হবে যেন সারা শরীরে পানি পৌঁছায়। আবার ডান কাতে শুইয়ে বাম দিক ধোয়াতে হবে। তারপর সোজা করে শুইয়ে সারা শরীর ধুয়ে দিতে হবে। সব সময় হাতে দস্তানা থাকবে। সব সময় লাশের লজ্জাস্থান থেকে দৃষ্টি দূরে রাখার চেষ্টা করতে হবে।

১৫. এইভাবে তিনবার পানি দিয়ে ধুতে হবে। প্রতিবারই ডান দিক থেকে শুরু হবে। শেষবার অর্থাৎ- তৃতীয়বার পানিতে কর্পূর মিশিয়ে ধোয়াতে হবে। তা উত্তম।

১৬. এখন লাশের উপরের ভিজা কাপড় সরিয়ে শুকনা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে যাতে তার সতর খুলে না যায়। ধীরে ধীরে শুকনা কাপড় দিয়ে চুল ও শরীর মুছে দিতে হবে। এই কাজের জন্য পরিষ্কার পুরনো শাড়ী বা ধোয়াকাপড় হলেও চলবে।

১৭. শরীরে কিছু কর্পূর লাগাতে হবে। শুধু চুলে আতর দিতে হবে। যদি রক্ত বা মল বা ময়লা কিছু আসে, তবে তুলার মধ্যে একটু কর্পূর দিয়ে সেখানে লাগিয়ে দিতে হবে।

১৮. ধীরে ধীরে চুল আঁচড়ে দিতে হবে। পুরুষদের চুল একপাশে, আর মেয়েদের চুল তিনটি বেণী করে পিছনে রেখে দিতে হবে। উম্মু 'আতিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (ﷺ)-এর কন্যার মাথার চুল তিনটি বেণী করেছেন। তাঁরা তা খুলেছেন, অতঃপর তা ধুয়ে তিনটি বেনী করেছেন।[৮৩]

১৯. নিকট আত্মীয়দের মধ্যে যারা আল্লাহ-ভীরু, তাদেরই উচিত গোসল দেওয়া। মৃত ব্যক্তির উপর পর্দা করতে হবে এবং গোসলের সময় কোনো অপছন্দনীয় বস্তু দেখলে তা বর্ণনা করা যাবে না।

২০. গোসলদানকারীর জন্য সুন্নাত হচ্ছে গোসল পরবর্তীতে সেও গোসল করবে।

[৮৩] *সহীহুল বুখারী।*

২১. গোসলের সময় প্রত্যেক অঙ্গ ধোয়ার সময় বিভিন্ন যিক্‌র বা দু'আ পড়া বিদআত। লাশ তোলা-নামার সময় 'লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' যিক্‌র বা অন্য কোনো যিক্‌র বিদআত।

বি. দ্র. আগুনে পোড়া অথবা শরীর বেশি ক্ষত-বিক্ষত থাকলে গোসল দেওয়ায় সমস্যা হলে সেই স্থানে কাপড় বা ব্যান্ডেজ জড়িয়ে ঐ অঙ্গ মাসেহ করে দিতে হবে। আর সেটাও সম্ভব না হলে তায়াম্মুম করে দিতে হবে।

মৃতের কাফনের কাপড় ও আনুষাঙ্গিক বিষয়াদি :

(১) মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার পর তাকে কাফনের কাপড় পরানো ওয়াযিব। কারণ নবী (ﷺ) কাফনের কাপড় পরিধান করানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[৮৪]

(২) কাফনের কাপড় বা তার মূল্য মৃত ব্যক্তির সম্পদ থেকে ব্যয় করতে হবে। তবে কিছুই না থাকলে তার অভিভাবকরা ব্যবস্থা করবে। কাফনের কাপড় একটু মোটা ধরনের মধ্যম দামের মধ্যে কেনা উত্তম। অবশ্যই কাপড়টা সুতির হতে হবে।[৮৫]

(৩) কাফনের কাপড় যেন তার সম্পূর্ণ শরীরকে ঢেকে ফেলে। কারণ রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "তোমাদের কোনো ব্যক্তি যখন তার ভাইকে কাফন পরিধান করাবে তখন সে যেন তাকে সুন্দরভাবে কাফন পরিধান করায়।"[৮৬]

(৪) যুদ্ধের ময়দানের শহীদের পরিধেয় পোষাক খুলে ফেলা না-জায়িয; বরং তাকে তার রক্ত মাখা পোষাকসহ দাফন করতে হবে।[৮৭]

কাফনের কাপড়ের ব্যাপারে করণীয় :

১. কাফনের কাপড়টি সাদা হওয়া মোস্তাহাব : কারণ রাসূল (ﷺ) নির্দেশ দিয়েছেন : "তোমরা সাদা কাপড় পরিধান করো, কারণ সাদা কাপড়ই হচ্ছে সর্বোত্তম এবং সাদা কাপড় দ্বারা তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।"[৮৮]

২. তিনটি কাপড় হওয়া মোস্তাহাব পুরুষদের : কারণ 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন : "রাসূল (ﷺ)-কে তিনটি ইয়ামানের সাহুলী গ্রামের সাদা সূতী কাপড় দিয়ে কাফন দেয়া হয়েছিল। যেগুলোর মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না।[৮৯] মহিলাদের ৫টি কাফনের কাপড় হাসান (রাহিমাহুল্লাহ) বলেছেন, ৫ম বস্ত্রখানা দ্বারা কামিজের নিচে উরুদ্বয় ও নিতম্বদ্বয় বেঁধে দিবে। একটা বস্ত্রখণ্ড দ্বারা মাথায় হেজাব হিসাবে পড়ায়ে দিতে হবে।

উম্মু 'আত্বিয়াহ্ (রাযিয়াল্লা-হু আনহা) হতে বর্ণিত, নবী (ﷺ) তার মৃত কন্যাকে গোসল দেওয়ার সময় বললেন, তোমরা তাঁকে

[৮৪] *সহীহুল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।*
[৮৫] *সহীহুল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।*
[৮৬] *সহীহ্ মুসলিম; সুনান আবূ দাঊদ।*
[৮৭] *সহীহুল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।*
[৮৮] *সুনান আবূ দাঊদ; জামে' আত্ তিরমিযী।*
[৮৯] *সহীহুল বুখারী; সহীহ্ মুসলিম।*

তিনবার পাঁচবার অথবা প্রয়োজনে তার চেয়ে অধিকবার বরই পাতাসহ পানি দিয়ে গোসল দাও। আর শেষবারে কর্পূর দাও। তোমরা শেষ করে আমাকে জানাবে। তিনি বলেন, আমরা যখন শেষ করলাম, তখন আল্লাহর রাসূল (ﷺ) তাঁর চাদর আমাদের দিকে নিক্ষেপ করে বললেন : এটা তাঁর শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। উম্মু ‘আত্বিয়্যাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর অধিক বর্ণনা করেননি। (আইয়্যূব [রাহিমাহুল্লাহ] বলেন,) আমি জানি না, নবী (ﷺ)-এর কোন কন্যা ছিলেন? তিনি বলেন, অর্ধেক শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দাও। ইবনু সীরীন (রাহিমাহুল্লাহ) মহিলা সম্পর্কে এভাবেই আদেশ করতেন যে, ভিতরের কাপড় শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে দিবে, ইজারের মতো ব্যবহার করবে না।[৯০]

বি. দ্র. *‘আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) থেকে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ)-কে তিনটি কাপড়ে দাফন করা হয়েছিল।*[৯১]

অতএব পুরুষ-নারী উভয়কে তিন কাপড়ে দাফন দিতে হবে। *(উৎস : ‘জাল হাদীসের কবলে রাসূলুল্লাহ [ﷺ]-এর সালাত- অধ্যায় : সালাতুল জানায়িয)*

এ ব্যাপারে কয়েকজন ইসলামী স্কলারকে জিজ্ঞাসা করা হলে, তারা বলেন, কাফনের কাপড় মৃত ব্যক্তির ‘আমল নয়, তা নিয়ে ফিৎনা করা অযৌক্তিক। আল্লাহ আমাদের সঠিক জ্ঞান দান করার ক্ষমতা দান করুন —আমীন।

৩. কাফনের কাপড়ে ৩ বার সুগন্ধি (আগরবাতির ধুয়া) লাগানো জায়িয : এক্ষেত্রে পুরুষ নারীর পার্থক্য নেই।

মৃতব্যক্তিকে কাফন পড়ানো :

১. খাটিয়ার উপর প্রথমে তিনটি ফিতা সমান্তরালভাবে বিছাতে হবে। প্রথমটি মাথার ঠিক উপরে, দ্বিতীয়টি কোমর বরাবর, তৃতীয়টি পায়ের নীচে। মাথা ও পায়ে বাধনের গিট দিয়ে মাঝে ১-৫টি বাধন দেওয়া যায়।

২. কাফনের কাপড়গুলো একটির উপর আরেকটি বিছাতে হবে। প্রথমে লিফাফা, তার উপর ইযার (যা মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢেকে রাখবে), তার উপর কামিজ। কামিজটা গলাকাটা থাকবে যার এক অংশ উপড়ের দিকে গুটিয়ে রাখতে হবে। মহিলাদের মাথা ও বুক ঢাকার জন্য অতিরিক্ত দু’টি কাপড় লাগে। মহিলাদের জন্য কামিজের নীচে সিনাবন্ধ (বুক ঢাকার কাপড়) বিছাতে হবে।

৩. এরপর সে টেবিল বা খাটিয়া যাতে কাফনের কাপড় বিছানো হয়েছে তা গোসলের টেবিলের কাছে আনবেন। এরপর লাশের কোমরের নীচে ২/৩ জন ধরবেন, একজন মাথার দিকে ধরবেন আর ২/১ জন পায়ের দিকে ধরবেন। খুব সতর্কতার সাথে চাদর দিয়ে ঢাকা লাশকে বিছানো কাফনের উপর শুইয়ে দিতে হবে। কামিজের গলাকাটা জায়গাতে মাথা রেখে উপর দিয়ে গুটানো অংশটুকু তাড়াতাড়ি টেনে ঢেকে দিতে হবে। এবার লাশ ঢাকা কাপড়টা টেনে বের করে নিতে হবে।

[৯০] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৬১।*
[৯১] *সহীহুল বুখারী- হা. ১২৭২।*

৪. এরপর সিনাবন্ধ প্রথমে ডানদিক তার উপর বামদিকে পেঁচিয়ে দিতে হবে। একই নিয়মে এরপর ইযার পেঁচিয়ে দিতে হবে। শেষে লিফাফা দিয়ে পেঁচিয়ে ফিতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে দিতে হবে। মহিলাদের মাথার তিন কোনা কাপড় দিয়ে এমনভাবে হিজাব করতে হবে যাতে চুল না দেখা যায়।

৫. কাফনে দু‘আ লেখা বা কাফনের সাথে আহাদনামা বা পীরের রুমাল বা কাবার গিলাফ ইত্যাদি দিয়ে দেওয়া বিদআত।

মৃতকে গোসল, কবর খনন, দাফন ও জানাযার সওয়াব

মৃতকে গোসলের সওয়াব : দু’টি শর্তে বিশাল সওয়াব। যথা- **১.** যে ব্যক্তি মৃতকে গোসল করাবে আর গোপনীয়তাকে রক্ষা করবে এবং অপছন্দনীয় কোনো কিছু দেখার পর কোনো ব্যক্তিকেই তা জানাবে না। **২.** মৃত ব্যক্তির গোসল করানোর দ্বারা সে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করবে, কোনো বিনিময়, শুকরিয়া অথবা অন্য কোনো কিছু প্রত্যাশা করবে না। এই দু’টি শর্ত সাপেক্ষে সে বিরাট সওয়াবের অধিকারী হবে। কারণ রাসূল (ﷺ) বলেছেন, “যে কোনো মুসলিম মৃত ব্যক্তিকে গোসল করাবে এবং তার গোপনীয়তাকে লুকিয়ে রাখবে, তাকে আল্লাহ চল্লিশবার ক্ষমা করে দিবেন।”[৯২] তবে হাসিমুখ, দেহে ঔজ্জ্বল্য প্রভৃতি দেখলে বা সুগন্ধ পেলে তা প্রকাশ করতে পারে।

মৃতকে কাফনের কাপড় পরানোর সাওয়াব

“যে ব্যক্তি কাফন পড়িয়ে দিবে তাকে আল্লাহ কিয়ামতের দিন পুরু স্বর্ণখচিত জান্নাতের পোশাক ও পাতলা মিহি রেশমী পোশাক পড়িয়ে দিবেন।”[৯৩] যে মৃত ব্যক্তির জন্য গর্ত (কবর) খনন করবে অতঃপর তাকে ঢেকে দিবে, কিয়ামত দিবস পর্যন্ত তার বসবাসের জন্য সাদাক্বাহ্ হিসেবে একটি ঘর তৈরি করে দিলে যে সওয়াব পেত তার জন্য সে সওয়াব লিখে দেয়া হবে।

জানাযা ও দাফনের সওয়াব

আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি মৃতের জানাযার সালাত আদায়ে উপস্থিত থাকবে তার জন্য এক কীরাত, যে ব্যক্তি মৃতের দাফন হয়ে যাওয়ায় উপস্থিত থাকবে তার জন্য দু’ কীরাত। জিজ্ঞাসা করা হলো দু’ কীরাত কি? তিনি বললেন, দু’টি বিশাল পর্বত সমতুল্য সওয়াব।[৯৪] আল্লাহ আমাদের নেক ‘আমল করার তাওফীক্ব দান করুন —আমীন। ☒

[৯২] *হাকিম বলেন, হাদীসটি মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ। বিস্তারীত জানতে দেখুন : আহকামুল জানায়েয- মাসআলা নং- ৩০।*
[৯৩] *হাদীসটি হাকিম (১/৩৫৪, ৩৬২); বাইহাক্বী (৩/৩৯৫) ও আসবাহানী “আত্ তারগীব” (১/২৩৫) গ্রন্থে আবূ রাফে‘ হতে বর্ণনা করেছেন।*
[৯৪] *সহীহুল বুখারী; সহীহ মুসলিম।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ক্বাসাসুল ক্বুরআন

জুলকারনাইন ও তার নির্মিত দেয়াল

–আবু তাহসীন মুহাম্মদ

জুলকারনাইন একজন সৎ ও ন্যায়পারায়ণ বাদশাহ ছিলেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশসমূহ জয় করেছিলেন। এসব বিজিত দেশে তিনি ন্যায়বিচার কায়েম করেছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে সব ধরনের সাজ-সরঞ্জাম দান করেছিলেন। জুলকারনাইন পৃথিবীর তিন প্রান্ত অর্থাৎ- প্রাচ্য, পাশ্চাত্য এবং উত্তরে পর্বতমালার পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন। এখানে দু'পর্বতের মধ্যবর্তী গিরিপথকে তিনি একটি সুবিশাল লৌহ প্রাচীর দ্বারা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ফলে ইয়াজূজ ও মাজূজের লুটতরাজ থেকে সে এলাকার জনগণ নিরাপত্তা লাভ করেছিল।[৯৫]

ইয়াজূজ এবং মাজূজের উদ্ভব

ইয়াজূজ এবং মাজূজ হচ্ছে আদম সন্তানের মধ্যে দু'টি গোত্র, যেমনটি হাদীসে এবং বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে কিছু মানুষ অস্বাভাবিক বেঁটে, আবার কিছু অস্বাভাবিক লম্বা। কিছু অনির্ভরযোগ্য কথাও প্রসিদ্ধ যে তাদের মাঝে বৃহৎ কর্ণবিশিষ্ট মানুষও আছে, এক কান মাটিতে বিছিয়ে এবং অপর কান গায়ে জড়িয়ে বিশ্রাম করে; বরং তারা হচ্ছে সাধারণ আদম সন্তান। বাদশা জুলকারনাইনের যুগে তারা অত্যধিক বিশৃঙ্খল জাতি হিসেবে প্রসিদ্ধ ছিল। অনিষ্টটা থেকে মানুষকে বাঁচাতে জুলকারনাইন তাদের প্রবেশ পথ বৃহৎ প্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন। নবী কারীম (ﷺ) বলে গেছেন যে, 'ঈসা নবী অবতরণের পর তারা সেই প্রাচীর ভেঙে বেরিয়ে আসবে। মহান আল্লাহর আদেশে 'ঈসা (আলাইহিস সালাম) মু'মিনদেরকে নিয়ে তূর পর্বতে আশ্রয় নেবেন।

জুলকারনাইন পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে বেড়াতেন নির্যাতিত, বঞ্চিত, শাসকের হাতে শোষিত লোকদের মুক্তি দিতেন। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী অরুণাচলে, যেখান থেকে সূর্য উদিত হয় সেখানে ইয়াজুজ, মাজুজের হাত থেকে জনগণকে রক্ষা করার জন্য দেয়াল তুলে দিয়েছিলেন জুলকারনাইন। আর সে স্থানটি পাহাড়ের প্রাচীরের মাঝখানে। সূরা আল-কাহ্ফ-এ জুলকারনাইনের এই প্রাচীর নির্মাণের উল্লেখ আছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ثُمَّ اَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتّٰۤى اِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُوْنِهِمَا قَوْمًا ۙ لَّا يَكَادُوْنَ يَفْقَهُوْنَ قَوْلًا ۞ قَالُوْا يٰذَا الْقَرْنَيْنِ اِنَّ يَاْجُوْجَ وَ مَاْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلٰۤى اَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَهُمْ سَدًّا ۞ قَالَ مَا مَكَّنِّىْ فِيْهِ رَبِّىْ خَيْرٌ فَاَعِيْنُوْنِىْ بِقُوَّةٍ اَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا ۞ اٰتُوْنِىْ زُبَرَ الْحَدِيْدِ ؕ حَتّٰۤى اِذَا سَاوٰى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا جَعَلَهٗ نَارًا ۙ قَالَ اٰتُوْنِىْۤ اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۞ فَمَا اسْطَاعُوْۤا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا لَهٗ نَقْبًا ۞ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّىْ ۚ فَاِذَا جَآءَ وَعْدُ رَبِّىْ جَعَلَهٗ دَكَّآءَ ۚ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّىْ حَقًّا ۞ وَ تَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَّمُوْجُ فِىْ بَعْضٍ وَّ نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَجَمَعْنٰهُمْ جَمْعًا ۞

"আবার সে এক পথ ধরল, চলতে চলতে সে যখন দু' পর্বত-প্রাচীরের মধ্যবর্তী স্থলে পৌঁছাল তখন তথায় সে এক সম্প্রদায়কে পেল যারা কোন কথা বুঝার মতো ছিল না। তারা বলল, 'হে যুল-কার্নায়ন! ইয়াজূজ ও মাজূজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করছে। আমরা কি আপনাকে খরচ দিব যে, আপনি আমাদের ও তাদের মধ্যে এক প্রাচীর গড়ে দিবেন'? সে বলল, 'আমার প্রতিপালক আমাকে যে ক্ষমতা দিয়েছেন, তাই উৎকৃষ্ট। সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য করো, আমি তোমাদের ও তাদের মধ্যস্থলে এক মজবুত প্রাচীর গড়ে দিব। 'তোমরা আমার নিকট লৌহপিণ্ডসমূহ আনয়ন করো', অতঃপর মধ্যবর্তী ফাঁকা স্থান পূর্ণ হয়ে যখন লৌহস্তূপ দু' পর্বতের সমান হলো তখন সে বলল, 'তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাকো।' যখন সেটা অগ্নিবৎ উত্তপ্ত হলো, তখন সে বলল, 'তোমরা গলিত তাম্র আনয়ন করো, আমি সেটা ঢেলে দেই এটার উপর।' এরপর তারা সেটা অতিক্রম করতে পারল না এবং সেটা ভেদও করতে পারল না। সে বলল, 'এটা আমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ। যখন আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি তাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন এবং আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সত্য।' সেদিন আমি তাদেরকে ছেড়ে দিব এ অবস্থায় যে, একদল আর একদলের উপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে এবং শিঙ্গায় ফুৎকার দেয়া হবে। অতঃপর আমি তাদের সকলকেই একত্র করব।"[৯৬]

[পরবর্তী অংশ ২০ পৃষ্ঠায় দেখুন]

[৯৫] *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ- ইবনু কাসীর, ২/১০৩।*

[৯৬] *সূরা আল-কাহ্ফ : ৯২-৯৯।*

বিশেষ মাসায়িল

ইসলাম কি কুশপুত্তলিকা দাহ সমর্থন করে?

"রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর যা কিছু নিষেধ করেছেন তা বর্জন করো।" *(সূরা আল হাশ্‌র ৫৯ : ৭)*

আরাফাত ডেস্ক : কুশপুত্তলিকা দাহ আমাদের কাছে অতি পরিচিত একটি শব্দ। বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশসহ আন্তর্জাতিক অঙ্গণেও কুশপুত্তলিকা দাহের ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ সমাজে প্রচলিত কোনো আদর্শ বা মতবাদের বিরুদ্ধে যখন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অবস্থান গ্রহণ করেন কিংবা সেই আদর্শ বা মতবাদকে কটাক্ষ করে বক্তব্য প্রদান করেন, অথবা এ জাতীয় কোনো ইস্যুকে কেন্দ্র করে ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে প্রতিবাদস্বরূপ সেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠীপ্রধানের প্রতীকি মূর্তি তৈরি করে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দেয়া হয়। একেই কুশপুত্তলিকা দাহ বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হলো– কুশপুত্তলিকা বানানো ইসলাম সমর্থন করে কী?

এ কথা স্বতোসিদ্ধ যে, ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষ বা কোনো প্রাণির প্রতিমা, মূর্তি, প্রতিকৃতি, প্রতিমূর্তি ও ভাস্কর্য নির্মাণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ এবং এটি ক্বারীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। বহু হাদীসে মূর্তি-প্রতিমূর্তি ভেঙ্গে ফেলার এবং ছবি মুছে ফেলার ব্যাপারে কঠোরভাবে নির্দেশ এসেছে। নিম্নে এ সংক্রান্ত কতিপয় হাদীস তুলে ধরা হলো– রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

أَنْ لَا تَدَعَ قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ، وَلَا تِمْثَالًا إِلَّا طَمَسْتَهُ.

কোনো উঁচু কবরকে মাটি বরাবর না করে আর কোনো প্রতিকৃতিকে না মুছে ছাড়বে না।[৯৭] অন্য বর্ণনায় রয়েছে–

وَلَا صُوْرَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا.

আর কোনও ছবিকে না মুছে ছাড়বে না।[৯৮]

ইমাম মুসলিম (রহমাতুল্লাহি আলাইহি) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, আমরা (একবার) মাসরূকের সাথে ইয়াসার ইবনু নুমাইরের ঘরে ছিলাম। মাসরূক ইয়াসারের ঘরের আঙিনায় কতগুলো মূর্তি দেখতে পেয়ে বললেন, আমি 'আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে শুনেছি এবং তিনি নবী (ﷺ)-কে বলতে শুনেছেন যে,

إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ.

"(ক্বিয়ামতের দিন) মানুষের মধ্যে সব থেকে শক্ত শাস্তি হবে তাদের, যারা ছবি তৈরি করে।"[৯৯]

ইবনু 'আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِيْ الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

যে ব্যক্তি ছবি তৈরি করে, তাকে কিয়ামতের দিন তাতে জীবন দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে, কিন্তু সে সক্ষম হবে না।[১০০] 'আব্দুল্লাহ ইবনু 'উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন :

إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ القِيَامَةِ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَا خَلَقْتُمْ.

যারা এ জাতীয় (প্রাণির) ছবি তৈরি করে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের শাস্তি দেয়া হবে। তাদের বলা হবে, তোমরা যা বানিয়েছিলে তাতে জীবন দাও।[১০১]

এ সকল হাদীস থেকে প্রমাণিত হয়, প্রাণির প্রতিমা, মূর্তি, প্রতিমূর্তি, প্রতিকৃতি, ভাস্কর্য ইত্যাদি তৈরি করা বা নির্মাণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও হারাম। সুতরাং কুশপুত্তলিকা তৈরি করাও ক্বীরা গুনাহ ও হারাম। মূলতঃ এটি পৌত্তলিকতার সংস্কৃতির নামান্তর।

স্মর্তব্য যে, ইসলাম ন্যায়-নীতি ও মানবতার ধর্ম। ইসলাম কখনো কোনোপ্রকার অন্যায়-অধর্ম সমর্থন করে না। তবে ইসলামে প্রতিবাদের নিজস্ব নিয়ম-নীতি ও পদ্ধতি রয়েছে। কিন্তু প্রতিমা পোড়ানোর রীতি কখনোই ইসলামে স্বীকৃত ছিল না। অতএব, এই জঘন্য রীতিটি যে অমুসলিমদের থেকে মুসলিমদের মাঝে অনুপ্রবেশ করেছে তা নিশ্চিত করেই বলা যায়। তাছাড়া কোনো ধরনের জ্বালাও-পোড়াও নীতিও ইসলাম সমর্থন করে না।

পরিশেষে বলবো, আমরা অবশ্যই অন্যায়ের প্রতিবাদ করবো, কিন্তু তা হবে শরী'আত অনুমোদিত পদ্ধতিতে। অমুসলিমদের দেখানো পদ্ধতি অনুসরণ করা কখনো মুসলিমদের জন্য কল্যাণকর নয়। তাই কুশপুত্তলিকা দাহ করার কুপ্রথা অবশ্যই বর্জনীয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে হিফাযত করুন –আমীন। ⊠

[৯৭] *সহীহ মুসলিম- হা.৯৬৯; জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১০৪৯।*
[৯৮] *সহীহ মুসলিম- হা. ৯৬৯।*
[৯৯] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৫০।*
[১০০] *সহীহ মুসলিম- হা. ২১১০ (১০০)।*
[১০১] *সহীহুল বুখারী- হা. ৫৯৫১।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রচলিত ওয়াজ মাহফিল ও সমাজের বাস্তবতা

–মোহাম্মদ মাযহারুল ইসলাম★

ইসলামী শরিয়াত ব্যবস্থা নিছক কোনো একটি আনুষ্ঠানিকতা (Islam is not merely a retualistic ideology) কিংবা কতিপয় মিশনারির নাম নয় (Islam is not simple a mission); বরং ইসলাম সামগ্রিক অর্থে পরিপূর্ণ এবং তাঁর পথ ও পদ্ধতিও চূড়ান্ত, গৃহীত। আল্লাহর নবী (ﷺ) সর্বশেষ নবী ও রাসূল। যিনি ইসলামকে গোটা পৃথিবীর কাছে সর্বোত্তম পথ ও পন্থায় উপস্থাপন করেছেন। দ্বীনের দা'ওয়াতকে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য করার লক্ষ্যে তিনি ইসলামী দা'ওয়াতের মহত্তম নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন যাতে করে দ্বীনের ব্যাপারে কেউ প্রশ্নবিদ্ধ করার সুযোগ না পায়। তিনি তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বকে উম্মতের উপর সোপর্দ করে বলেন–

«بَلِّغُوْا عَنِّيْ وَلَوْ آيَةً»

তোমরা আমার পক্ষ থেকে একটি আয়াত হলেও তা পৌঁছে দাও।[১০২]

দ্বীন প্রচারের অনেক মাধ্যমের মধ্যে অন্যতম একটি মাধ্যম হলো– ওয়াজ, মাহফিল। ভারতীয় উপমহাদেশে এই প্রথা যুগের পর যুগ চলমান। বিশেষত বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই প্রথা যুগের পর যুগ শীতকাল কে কেন্দ্র করে আয়োজন করা হয়ে থাকে। যদিও দ্বীন প্রচারের জন্য কোনো সময়ের ফ্রেমে আবদ্ধ রাখা কোনো কালেই উচিৎ নয় এবং এটা কোনো স্বীকৃত বিষয়ও নয়। তথাপিও এই প্রথা চলছে দ্বীনের প্রচার প্রসারের নামে। জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন আর বিভিন্ন প্রস্তুতির প্রহর শেষে একটি সফল ওয়াজ মাহফিল আয়োজন করা নিঃসন্দেহে বিশাল গুরু দায়িত্বপূর্ণ কাজ।

কিন্তু এই প্রচলিত চলমান শীতকালীন মাহফিল সম্পর্কে একবার ভেবে দেখেছেন? প্রচলিত ওয়াজ মাহফিল সমাজ পরিবর্তনে কি কার্যকরী ভূমিকা কিংবা প্রভাব ফেলে? শহরে বন্দরে, গ্রামে গঞ্জের অলী গলী পেরিয়ে সর্বত্র চলে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন। বক্তার বক্তব্য, শ্রোতার উপস্থিতি এবং এ আয়োজনকে সাফল্যমণ্ডিত করার নিমিত্তে সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীল বৃন্দ কত মেহনত, সময়, শ্রম কুরবানী দেয় অথচ দা'ওয়াতের পথ ও পদ্ধতি অবলম্বনে প্রায় প্রত্যেক পর্যায়ে ভুল পন্থা অবলম্বন করে থাকে। যার কারণে দা'ওয়াতি কাজ ফলপ্রসূ হয় না। যিনি আহ্বান করবেন (তথা বক্তা, আলোচক) তিনি কি এই আয়াতের অনুসরণ করছেন–

﴿قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِيْٓ اَدْعُوْٓا اِلَى اللّٰهِ ۚ عَلٰى بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِيْ ۚ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَمَآ اَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ﴾

"বলে দিন : এই আমার পথ। আমি আল্লাহর দিকে জেনে বুঝে দা'ওয়াত দেই আমি এবং আমার অনুসারীরা। আল্লাহ পবিত্র। আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত নই।"[১০৩]

অথচ দ্বীনের দা'ওয়াত প্রচার ও প্রসার আসমানের নিচে জমীনের উপরের সবচেয়ে বড় প্রশংসনীয়, মর্যাদাবান কাজ। বলা যায় বিনা পুঁজির লাভজনক ব্যবসা। কেননা কেউ যদি কাউকে ভালো কাজের দিকে আহ্বান করে আর সে যদি তাঁর অনুসরণ করে অতঃপর সে যদি কাউকে দা'ওয়াত দেয়। আর তার দা'ওয়াতে কেউ ভালো কাজের পথে চলে তাহলে উভয়ের সওয়াবের অংশ যিনি প্রথম ব্যক্তিকে ভালো পথের দিকে দা'ওয়াত দিয়ে দিক-নির্দেশনা করেছেন তাঁর সওয়াবের অংশ থেকে স্বয়ং নিজেও স ওয়াবের অংশ পাবেন। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা কারো সওয়াবের কমতি দিবেন না। এই লাভজনক দিকের পাশাপাশি একজন দ্বীনের দাঈ'র জন্য আরো বিশাল সুসংবাদ হলো আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়ে বলেন–

﴿وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَآ اِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَّقَالَ اِنَّنِيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾

"ঐ ব্যক্তির চাইতে কথায় উত্তম আর কে আছে, যে (মানুষকে) আল্লাহর দিকে ডাকে ও নিজে সৎকর্ম করে এবং বলে যে, নিশ্চয়ই আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।"[১০৪]

সুতরাং একজন ওয়াজকারী ব্যক্তির জন্য আবশ্যকীয় দায়িত্ব কর্তব্য হলো নববী তরীকায় ওয়াজ মাহফিলের মাঠে

★*শিক্ষক, রাযিয়া হিফযুল কুরআন এ্যান্ড ইসলামিক একাডেমী, সদর, দিনাজপুর ও পাঠাগার সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, দিনাজপুর জেলা শাখা।*

[১০২] *বুখারী- হা. ৩৪৬১; মিশকা-তুল মাসা-বীহ- হা. ১৯৮।*

[১০৩] *সূরা ইউসুফ : ১০৮।*

[১০৪] *হা-মীম, আস্-সাজদাহ/ফুস্সিলাত : ৩৩।*

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বক্তব্য প্রদান করা এবং সালাফ চরিতকে শ্রোতার সামনে উপস্থাপন করে সুন্দর সোনালী জীবনের রং তুলিতে মানুষের জীবনকে সাজানোর উৎসাহ প্রদান করা।

প্রচলিত ওয়াজ মাহফিলের চিত্র : চলমান প্রচলিত ওয়াজ মাহফিলের বাস্তব চিত্র ভীষণ অরুচিকর ও অপ্রত্যাশিত দৃশ্যের সেলুকাস বৈচিত্র্য ফুটে ওঠে। দ্বীনের দা'ওয়াতের মত বিশাল গুরু দায়িত্বকে নববী তরীকায় রুপায়িত করার যে বাস্তব সম্মত দূরদর্শী জ্ঞান, অভিজ্ঞতা আর পরিবেশ পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে ক্ষেত্র বিশেষে পরিবর্তনশীল তা বর্তমানের চলমান ওয়াজ মাহফিলের বলা যায় অধিকাংশ'রও বেশি আলোচক জানেই না কিংবা বুঝেই না। কেননা এই দায়িত্ব নিছক কোনো দায়িত্ব নয়; বরং এই বিশাল মাঠে অত্যন্ত বিচক্ষণতা, ধীরস্থিরতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা, ভাষা শালীনতা, নম্রতা, ভদ্রতা, মাধুর্যতা, কোমল হৃদয়ের অধিকারী হওয়া ছাড়াও বিভিন্ন দিক থেকে নিজেকে শাণিত করতে হয়। কারণ একজন দ্বীনের দাঈ' যত বেশি অভিজ্ঞ আর বিদ্যা বুদ্ধির অধিকারী হবে তাঁর দ্বারা দ্বীনের টেকসই কাজের খেদমত তত বেশি ফলপ্রসূ হবে ইন্‌শাআল্লাহ। একাধিক যৌগিক গুণের বদৌলতে একটি দা'ওয়াতি কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করা এবং এর যথার্থ ফলাফল স্বাভাবিকভাবে আশা করা যেতেই পারে। কিন্তু আমরা যদি আমাদের সমাজের দ্বীন প্রচারের নামে সময় কেন্দ্রীক শীতকালীন প্রচলিত ওয়াজ মাহফিলগুলোর চিত্র অবলোকন করি তাহলে আমাদের কাছে এর বিভৎস দৃশ্য এবং অরুচিকর, অপ্রত্যাশিত চিত্রের ফিরিস্তি চোখ বুঝলেই নিমিষেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বক্তার শারিরিক কুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ, বিভিন্ন ব্যক্তির সমালোচনা, গীবত, তোহমত, পরনিন্দা পরচর্চা, সিনেমা-নাটক পাড়ার বিভিন্ন দৃশ্য কিংবা গানের সুর, ডাইলগ নকল করে জনতার মঞ্চে বেশরমের মতো উপস্থাপন করাকে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করা, বক্তব্যের বিশাল মঞ্চে কুরআন সুন্নাহর কথাকে তেমনভাবে উল্লেখ না করে কিংবা উল্লেখ করলেও সালাফদের বুঝ অনুযায়ী না করে নিজের মতো করে বক্তব্য, সারমর্ম, ব্যাখ্যা পেশ করা, সাথে বিভিন্ন ধরণের জাল য'ঈফ হাদীস উপস্থাপনে শ্রোতাদের এই সকল জাল, য'ঈফ হাদীস অনুসরণের বিশাল বড় ফিতনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে এক শ্রেণীর বক্তা। মওসুমী ওয়াজ মাহফিলের আরেকটি চিত্র হলো– কিছু কিছু নাদান উঠতি বয়সের বক্তা ও বয়োজ্যেষ্ঠ বক্তা আছেন যারা বক্তব্য দেয়ার ক্ষেত্রে নববী তরীকায় বক্তব্য তো দেয় না বরঞ্চ অশালীন গালিগালাজ আর পরনিন্দার চর্চার সবক শেখায় সাথে বক্তব্য প্রদানে বিষয়বস্তুকে এমন শক্ত, কঠোর, রুঢ় ভাষায়, আচরণে প্রকাশ করে যাতে করে দা'ওয়াতের ভাবমূর্তি নষ্ট করে এবং মাদয়ু'ও (যাদেরকে আহ্বান করা হচ্ছে) এমন ভাবমূর্তি দেখে রীতিমত পিছিয়ে যায়। এজন্য প্রয়োজন এই ধারার মূলে আঘাত করে চলমান প্রচলিত ওয়াজ মাহফিলের পুরো সিস্টেমকে পরিবর্তন করা। যাতে করে একটি জ্ঞানভিত্তিক সচেতন প্রজন্ম গড়ে ওঠে।

বক্তার আধিক্যতা, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ আলেমের স্বল্পতা ও ইল্‌মের দৌন্যতা : নিঃসন্দেহে ছাহাবী পরবর্তী যুগ থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত আমরা বক্তার আধিক্যতা, বিজ্ঞ-প্রাজ্ঞ আলেমের স্বল্পতা ও ইল্‌মের দৌন্যতায় নিমজ্জিত। সেইসাথে চলমান পরিস্থিতিতে বক্তার চটকদারিতার মুখরোচক বক্তব্য ফিতনা রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। যদিও রাসূল (ﷺ) সুস্পষ্টভাবে কিয়ামতের পূর্বের আলামত বলে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন–

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ العِلْمُ، وَيَكْثُرَ الجَهْلُ».

কিয়ামতের অন্যতম নিদর্শন হলো– ইল্‌ম উঠিয়ে নেওয়া হবে এবং মূর্খতা বেড়ে যাবে।[১০৫]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন– নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বান্দাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নিবেন না; বরং আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইল্‌ম তুলে নিবেন।[১০৬]

উল্লেখিত হাদীস দু'টির সারকথার সাথে বাস্তবতা তুলনা করে দেখলেই আমাদের কাছে চলমান বিষয় স্পষ্ট হয়।

কিয়ামতের পূর্বে বিজ্ঞ আলেমের সংখ্যা কমে যাবে। আর যারা বেঁচে থাকবেন তাঁদেরকেও বক্তার আধিক্যতার ভীড়ে হারিয়ে যেতে হবে কিংবা তাদের নাম সকলের অগোচরেই থেকে যাবে। কারণ সকলের মাথায় ভাইরাল বক্তার বক্তব্যের পোকায় কামড় দিয়েছে। হক্ব শোনা কিংবা গ্রহণ করার ইচ্ছা হারিয়ে ফেলে জনগণের শতভাগ উপস্থিতি কিংবা গরম বক্তব্যের মাধ্যমে সুনাম সুখ্যাতি ছড়ানোর উদ্দেশ্যে রোগে আক্রান্ত হওয়ার দরুন বিজ্ঞ আলেমকে পিছনের সারিতে রেখে এক প্রকার যুল্‌ম করা হয় যা এই জাহেল সমাজের সুবোধ কাম্য।

সাহাবী যুগেই বিজ্ঞ আলেম ছিল বক্তা নগণ্য ছিল। তিনি সেই সাহাবীদের উদ্দেশ্যেই বলেছেন–

---

[১০৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮০ ও সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭১।*
[১০৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০০; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬৭৩।*

إنكم اليوم فى زمان كثير علماؤه قليل خطباؤه من ترك عشر ما يعرف فقد هوى.

“তোমরা এমন এক যুগে আছো যখন আলেমদের সংখ্যা বেশি আর বক্তার সংখ্যা কম। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর জানা বিষয়ের দশ ভাগের এক ভাগ ছেড়ে দিবে সে ধ্বংস হবে।”

«إِنَّكُمْ فِيْ زَمَانٍ مَنْ تَرَكَ مِنْكُمْ عُشْرَ مَا أُمِرَ بِهِ هَلَكَ ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ مَنْ عَمِلَ مِنْهُمْ بِعُشْرِ مَا أُمِرَ بِهِ نَجَا».

“এরপর এমন একটা যুগ আসবে যখন বক্তার আধিক্যতা হবে এবং আলেমের সংখ্যা কমে যাবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর জানা বিষয়ের দশ ভাগের এক ভাগ আঁকড়ে ধরবে সে নাজাত পাবে।”[১০৭]

বক্তা ও শ্রোতা : প্রচলিত ওয়াজ মাহফিলের নানাবিধ সমালোচিত রেওয়াজের মধ্যে অন্যতম একটি হলো– অধিকাংশ মাহফিল কমিটি বক্তা খুঁজে কে কত সেলিব্রিটি, ফেমাস, ভাইরাল। যদি কোনো বক্তাকে মাহফিলের জন্য সিলেক্ট করতে সিদ্ধান্ত নিতে চায় তাহলে আগে ইউটিউব এ প্রবেশ করে প্রথমত নাম সার্চ দিয়ে একটু বক্তব্য শুনে টেস্ট করে দেখে। উদ্দেশ্য দেখি তো বক্তব্য কেমন! তিনি কি আদৌও সেলিব্রিটি কিনা, তাঁর ফলোয়ার সংখ্যা কত! ইত্যাদি মূর্খতা মূলক কাজ করে থাকে। যা ইসলামী শরিয়তের বিপরীত সীমা লংঘন মূলক কাজ। কেননা বক্তার বক্তব্য নরম হোক আর গরম হোক। সেটা বিবেচ্য নয়; বরং বিবেচনার বিষয় হলো– বক্তব্য কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আলোকে দিচ্ছে কিনা সেটাই সবচেয়ে বড় লক্ষনীয় ও বিবেচ্য বিষয়। বর্তমান মাহফিল এন্তেজামিয়া কমিটি বৃন্দের আরেকটি ভুল দিক হলো নামিদামী বক্তা ঠিক করার জন্য অগ্রীম সিরিয়াল, জাঁকজমকপূর্ণ পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ছাড়াও প্রচারণা মাধ্যম সেইভাবে উপস্থাপন করার ক্ষেত্রে বেশি মনযোগী হয়ে ওঠার প্রবণতা ক্রমশ কমিটির সদস্যের কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। কারণ যত নামীদামী বক্তার নাম প্রচার হবে ততজন শ্রোতার উপস্থিতি হবে এবং এতে করে টাকা তো উত্তোলন হবেই সাথে গর্ব করতে পারবে যে, আমাদের মাহফিলে জনস্রোতের ঢল নেমেছিল। অথচ ইসলামের মৌলিক দিক হলো– লোক সংখ্যা পাঁচজন হোক আর পাঁচ কোটি হোক এতে কোনো যায় আসে না; বরং হক্ব কথা একজন হোক আর পাঁচ হাজার হোক যদি তাঁরা হক্ব শুনে, বুঝে আর ‘আমল করার চেষ্টা করে তাহলেই এই ওয়াজ মাহফিল সফল। এজন্য ইসলামে সংখ্যা গরিষ্ঠতাকে তেমন গুরুত্ব দেয়নি; বরং সংখ্যা লঘু হোক আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা হোক হক্বের মানদণ্ড হলো কিতাব এবং সুন্নাহ। যদিও তা একজন বিশ্বাস করে ও ‘আমল করে। আল্লাহ তা‘আলা কুরআনের কোনো আয়াতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অথবা রাসূল (ﷺ) কোনো হাদীসে বেশি সংখ্যাকে সফলতার মাপকাঠি হিসেবে নির্ধারণ করেননি। তিনি বলেছেন–

فَوَاللهِ لَأَنْ يُهْدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ.

‘আল্লাহর কসম তোমার দ্বারা যদি একজন ব্যক্তিও হেদায়াত লাভ করে তবে সেটি তোমার জন্য লাল উট কুরবানীর চাইতেও উত্তম।’[১০৮]

রাজনীতি চর্চা নাকি ইসলামের বিশুদ্ধ বার্তা ছড়া : ইদানিং ওয়াজ মাহফিলগুলোর অবস্থা দেখে মনে হয় যেন এটা কোনো ইসলামী মাহফিল নয়; বরং রাজনীতির কোনো আলোচনা সভা!? কেননা বর্তমানে চলমান অধিকাংশ মাহফিলগুলোতে ধর্ম, ‘আমল আখলাক চর্চা কিংবা নববী তরীকার বিশুদ্ধ সুমহান আদর্শকে উপস্থিত জনতার সামনে উপস্থাপন করে তাঁদের দীক্ষিত করা, প্রচার করার এই বিশাল ক্ষেত্রকে দিনে দিনে দখল করছে তথাকথিত বক্তা। যারা ইসলামের নামে, ওয়াজের নামে নিজস্ব ইসলামী দল কিংবা সেক্যুলার দলের সাফাই গাওয়া অথবা বিভিন্ন নেতা নেত্রীর নামে বিশাল প্রশংসনীয় পৃষ্ঠার বিবরণ উপস্থাপন করাকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করছে। ফলে এরা ওয়াজ মাহফিলের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যকে অনেক আগেই কলুষিত করেছে। এজন্য রাজনীতি মঞ্চ না বানিয়ে ইসলামী আলোচনা সভার পরিবেশ সৃষ্টি করা সময়ের অন্যতম দাবি। পাশাপাশি পোস্টার বা ব্যানারে কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির বিশাল নামের ফিরিস্তি না টেনে স্বাভাবিক নিয়মেই সম্মুখে অগ্রসর হওয়া শ্রেয়।

পরিশেষে বলতে চাই, দ্বীনের পুনর্জাগরণ দ্বীনের দা‘ওয়াত দ্বারাই সম্ভব। এজন্য দ্বীনের প্রচার প্রসারের সকল মাধ্যমকে যত বেশি পরিশীলিত করা যায় জাতির জন্য তা ততবেশি মঙ্গলজনক। চলমান এই মাহফিলের ধারাকে চলে আসা রেওয়াজের বিপরীতে ইসলামের টেকসই কার্যকরী ধারা চলমান রাখার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা এখন সময়ের দাবি। সেইসাথে এই ওয়াজ মাহফিলের যে সকল উত্থাপিত নানা সমস্যা তার মূলে আঘাত করে একটি সুন্দর রুচিকর ওয়াজ মাহফিল বাস্তবায়নে সকলের সুদৃষ্টি প্রত্যাশা করছি। ☒

[১০৭] *জামে‘ আত্ তিরমিযী- হা. ২২৬৭।*

[১০৮] *সহীহুল বুখারী- হা. ২৯৪২।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বিজ্ঞানের বিস্ময়কর ৬টি চমক

–আরাফাত ডেস্ক

১. স্ট্রোক ও কার্ডিওভাসকুলার প্রতিরোধে সবুজ সবজি : স্ট্রোক বা পক্ষাঘাত এবং কার্ডিওভাসকুলার বা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে প্রতিবছর বিশ্বে হাজার হাজার মানুষ মারা যায়। আজকাল আমাদের দেশেও এ ধরনের রোগে প্রচুর মানুষ মারা যায়। এর কারণ ও কার্যকরণ উদ্ভাবনের লক্ষ্যে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘসময় ব্যয় করেছেন। এর ফলে যেসব ওষুধ বা নিরাময় পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে তার সবগুলোই হয়েছে তবে সবগুলোই সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। রোগের উৎপত্তি, কারণ, আক্রান্ত স্থান, সময় এরূপ অনেক কিছুই নির্ভর ও বিবেচনা করে এসব ওষুধ প্রয়োগের উদ্যোগে বা ব্যবস্থা নিতে হয়। তাই যথাসময়েরর মধ্যে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগের অভাবে অনেক মানুষই অকালে মৃত্যু পথযাত্রী হয়। আবার যথাসময়ে যথাযথ ওষুধ প্রয়োগের ফলে অনেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রেহাই পায়। অসময়ে বা যথাসময়ে পূর্বে মানুষকে হারানোর এই যাতনা তা পরম ও চরম আত্মীয়ই নয় বিজ্ঞানীদেরও ব্যথিত করে। তাছাড়া এসব ওষুধ প্রয়োগের ক্ষেত্রে সামান্য ভুল-ত্রুটির কারণেও সাইড ইফেক্ট অর্থাৎ- পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকে। মানুষ হিসেবে আরেক মানুষকে বাঁচানোর জন্য এক মানুষের প্রতি অন্য মানুষের যে দায়িত্ব ও কর্তব্য সেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিবন্ধকতা থাকায় বিজ্ঞানীরা স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এ জটিল ও কঠিন রোগ নিরাময়ের উদ্যোগ নেন। তারা এক্ষেত্রে সার্থকও হয়েছেন।

একসময় মানুষ প্রতিদিনকার আহার্য কাঁচাই খেত। পাক করে খাবার প্রবণতা, আগুন আবিষ্কার ও শিল্প যুগের গোড়াপত্তন হওয়ার পরই মানুষের মনে সৃষ্টি হয়। পাক করে খাদ্য গ্রহণ যদিও অনেকটা রুচিশীলতার প্রতীক, কিন্তু আগুনের তীব্রতার তারতম্যের কারণে খাবারে বিদ্যমান অনেক খাদ্যপ্রাণই নষ্ট হয়ে যায়। যার জন্য খাদ্য গ্রহণ করা সত্ত্বেও আমরা অপুষ্টি, প্রয়োজনীয় রাসায়নিক ও খনিজ পদার্থ গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হই। ফলে আমাদের দৈহিক গঠনে ত্রুটি-বিচ্যুতির সৃষ্টি হয়। মূলত এসব ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যে আমাদের শরীরে বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি হয়। গবেষকরা গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন কোনো মানুষ যদি প্রতিদিন কমপক্ষে ৩০০ মাইক্রোগ্রাম ফোলেট আহার বা গ্রহণ করেন তাহলে স্ট্রোকে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা ২০% কমে যায়। শুধু তাই নয় ১৩% কার্ডিওভাসকুলার ডিজিজে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।

প্রকৃতিতে বিদ্যমান খাদ্য খেয়ে যখন স্ট্রোক ও কার্ডিওভাসকুলার রোগের মতো জটিল ও কঠিন রোগ চিকিৎসা করা যায় তখন সঙ্গত কারণেই অনেকে প্রশ্ন করবেন ফোলেট কোথায় বা কী ধরনের খাদ্যে বিদ্যমান। আসলে ফোলেট হচ্ছে এক ধরনের ভিটামিন। লেবু বা লেবু জাতীয় খাদ্য-টমেটো, সবুজ লতা-পাতাসম্পন্ন শাক-সবজি, সবজি হিসেবে ব্যবহৃত বাগানে চাষ করা উদ্ভিদ বিশেষ, লেটুস (সালাদে ব্যবহৃত কাঁচা খাওয়ার উপযুক্ত সবুজ পাতা জাতীয় উদ্ভিদ), খাদ্যশস্য ইত্যাদিতে ফোলেট প্রচুর পরিমাণ পাওয়া যায়। উক্ত পরিমাণে ফোলেট ব্যবহার করলে ব্যবহারকারীর কার্ডিওভাসকুলার সিস্টেমে বিশেষ প্রভাব ফেলায় হোমোসিস্টেনী (Homocysteine)'র পরিমাণের স্তরকে কমিয়ে দেয়। এই হোমোসিস্টেনিকে এক ধরনের এমিনো এসিড বলা যায় যার কাজ হচ্ছে মানুষের কোষগুলোর অস্বাভাবিক আচরণের ফলে ধমনি সংকোচিত হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাহায্য করায়। এই হোমোসিস্টেনির উপস্থিতি যখন ফোলেটের মাধ্যমে কখনো হয় তখন সঙ্গত কারণেই স্ট্রোক বা কার্ডিওভাসকুলার রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষ মারা যাওয়ার আশংকা কমে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে তাই যারা এ দু'টি রোগে আক্রান্ত হয়েছেন তাদের উচিত প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণে সবুজ শাক-সবজি খাওয়া। বিশেষ করে যেসব শাক-সবজিতে সবুজ লতা-পাতা বেশি সেগুলো এ ধরনের রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। তাই ওষুধের বিকল্প হিসেবে ফোলেট বেছে নিন।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

২. রক্তের দ্বারা বয়স নির্ণয় : রক্তের দ্বারা বয়স নির্ণয় করা যায় একথা শুনে অনেকেই অবাক হবেন এবং বলবেন, এটি বিজ্ঞানবিষয়ক কোনো খোশগল্প হয়তো? আসলে তা নয়। সম্প্রতি একদল বিজ্ঞানী রক্তের দ্বারা বয়স নির্ধারণের এক কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। একসময় মানুষ মারা গেলে যদি তিনি বেওয়ারিশ লাশ হতেন তখন হাড়ের মধ্যে যে রিং আছে তার বৃদ্ধি গণনা করে বয়স নির্ধারণ করা হতো। আজো আমাদের মতো দেশে তাই করা হচ্ছে। কিন্তু এ কাজ করার জন্য মৃত ব্যক্তির দেহে অস্ত্রোপচারের উদ্যোগ নিতে হয় যা অনেকটা ঝামেলাতো বটেই ব্যয়সাপেক্ষ বিরক্তিকর কাজ। অথচ মানুষ নয় যেকোনো প্রাণীর শরীর থেকে এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে অনায়াসে তার বয়স নির্ণয় করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের লোয়া স্টেট ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানী মার্ক হ্যাসম্যানের নেতৃত্বে একদল বিজ্ঞানী সম্প্রতি এই পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। আপাতত তারা এই পদ্ধতির কোনো নামকরণ করেননি।

এই পদ্ধতিতে প্রাণীদেহের এক ফোঁটা রক্ত নিয়ে এর সেল ডিভিশনকে সম্প্রসারিত করে দেখা হয় টিলোমেরাস নামক ক্রোমজোমগুলোর শেষে পুনরাবৃত্তিমূলক সিকোয়েন্সগুলো খুঁজে। এ সময় এ কাজে ব্যবহৃত কৌশল সর্বশেষ সিকোয়েন্সগুলো সঙ্গত কারণেই খুঁজে পায় না। তখন ধরে নেয়া হয় প্রাণীদের বয়স বাড়ার কারণে টিলোমেরাস ছোট হয়ে গেছে। টিলোমেরাস ছোট হয়ে যাওয়ার ওপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানীরা বয়স বাড়ার বিষয়টি নির্ধারণ করেন।

এ বিজ্ঞানীরা গবেষণার সময় অশ্বাকৃতির এক ধরনের ছোট প্রাণীর (জেব্রা ফিনচ) শরীর থেকে রক্ত নিয়ে গবেষণা করেছিলেন। তাদের পরীক্ষা শেষে প্রাণীটির বয়স ১০ বছর নির্ণয় করা হয়েছিল। এরপর অন্যান্য কৌশল প্রয়োগ করে এই প্রাণীর বয়স নির্ণয় করা হলে একই ফলাফল পাওয়া গিয়েছিল। তা থেকেই বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হন এটি একটি কার্যকর পদ্ধতি।

৩. বায়ুমণ্ডলে প্রতি বছর কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির পরিমাণ ১% : বিজ্ঞানীরা সাম্প্রতিক এক গবেষণার মাধ্যমে জানতে পেরেছেন বায়ুমণ্ডলে প্রতি বছর কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির পরিমাণ ১%। বেলজিয়ামের রয়েল অবজারভেটরি এবং ক্যাথলিক ইউনিভার্সিটি অব লৌভ্যানের বিজ্ঞানী ওলিভিয়ার ডি ভাইরনের নেতৃত্বে পরিচালিত এই গবেষণার বিজ্ঞানীরা এই তথ্য-উপাত্ত প্রমাণ করেন।

এই বিজ্ঞানীদের মতে, বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধির এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে প্রায় ৭০ বছর পর বায়ুমণ্ডলে বিদ্যমান কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে। নির্ভুলভাবে পরিমাপের ফলে দেখা গেছে।

কার্বন ডাই-অক্সাইড প্রতিদিন প্রায় ১০ মাইক্রোসেকেন্ডের সমান বৃদ্ধি পায়। বিশ্বে প্রতিদিন যে পরিমাণ কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয় এবং প্রাকৃতিক কারণে তা শোষণ এবং অন্য বস্তুতে রূপান্তরকরণ হয় এতে ভারসাম্যতা বজায় না থাকায় এসব কার্বন ডাই-অক্সাইড অপরিবর্তনীয় অবস্থা বায়ুমণ্ডলে ভেসে বেড়ায়। তাছাড়া বায়ুমণ্ডলে উত্তপ্ত হাওয়ারও সৃষ্টি হয়। এর ফলে মরু অঞ্চলে জমে উঠা বিশাল বরফগুলো উত্তপ্ত হাওয়ার সংস্পর্শে এসে ভারসাম্যহীন অবস্থায় গলতে শুরু করে। এই অস্বাভাবিকতার কারণে পূর্ব থেকে পশ্চিমে বা পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে হাওয়া দ্রুতবেগে ছুটে যায়। গরম হাওয়া পৃথিবীর কুমেরু অঞ্চলে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার সাথে মেশার ফলে বায়বীয় কার্বন ডাই-অক্সাইড যদিও কিছুটা সলিড (তরল বা বায়বীয় আকারে নয় এমন কঠিন) আকার ধারণ করে কিন্তু এতে বাতাসের স্বাভাবিকতা বজায় থাকে না। তাই এই বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকলে এমন একসময় আসবে যখন ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয় দেখা দিবে।

৪. বিকল্প জ্বালানি কার্বন ন্যানোপোরাস : যানবাহন এবং শিল্প কারখানা থেকে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডের জন্য যে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে তা প্রতিরোধের উপায় বের করার জন্য বিজ্ঞানীরা যখন হিমশিম খাচ্ছেন তখন কলম্বিয়ার একদল বিজ্ঞানী কার্বন থেকে উৎপাদিত বিকল্প জ্বালানি তৈরির এক কৌশল উদ্ভাবন করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে তাই মনে হলেও মূলত মিথেন (বর্ণহীন, গন্ধহীন, দাহ গ্যাস বিশেষ (CH4) যা কয়লা খনিতে এবং জলা অঞ্চলে দেখা যায়) থেকে উচ্চ চাপের মাধ্যমে এই জ্বালানি তৈরি করা যায়। সাধারণত বায়ু বিশুদ্ধকরণ এবং পানি বিশুদ্ধকরণের জন্য পোরাস ম্যাটারিয়েল (যার

মধ্যে দিয়ে তরল পদার্থ চলাচল করতে পারে) ব্যবহার করা হয়।

মিশেরি ইউনিভার্সিটির পদার্থবিদ পিটার ফাইজার এবং তার সহকর্মীরা কার্বন ন্যানোপোরাসের মধ্যে এই ম্যাটারিয়েলের সন্ধান পেয়েছেন। নতুন উদ্ভাবিত এই পদ্ধতির কথা যখন এই বিজ্ঞানীরা প্রথম ব্যক্ত করেন তখন অনেকেই সমালোচনার বান ছুড়ে দিয়ে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা কামনা করেন।

এর পরিপ্রেক্ষতে বিজ্ঞানীরা জানান, বর্তমান মিথেনকে কোনো প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত ভারি স্টিল দ্বারা তৈরি সিলিন্ডারের মধ্যে অত্যধিক চাপ (কমপক্ষে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৩০০০ পাউন্ড) প্রদান করে সংরক্ষণ করা হয়। অত্যধিক নড়াচড়া বা ঝুঁকিপূর্ণ আঘাতের ফলে এরূপ সিলিন্ডার বিস্ফোরণ ঘটার সম্ভাবনা থাকে। অথচ কার্বন ন্যানোপোরাস মিথেনকে আরো কম চাপে প্রতি বর্গ ইঞ্চিতে ৫৩০ পাউন্ড ভারি স্টিল দ্বারা তৈরি সিলিন্ডারের মধ্যে ঝুঁকিমুক্ত অবস্থায় সংরক্ষণের সুযোগ দেয়। তাই মিথেনভর্তি সিলিন্ডার দ্বারা কার্বন ন্যানাপোরাসের সাহায্যে যেকোনো যানবাহন চালানো যাবে। বর্তমানে গ্যাস সিলিন্ডার দিয়ে যেভাবে যানবাহন চালানো হয় বিজ্ঞানীদের মতে সে স্থলে কার্বন ন্যানোপোরাসের সাহায্যে মিথেন ব্যবহার করে ঝুঁকি ছাড়াই একই কাজ করা যাবে।

৫. নাইট্রোজেনভিত্তিক রেডিয়েশন ডিটেক্টর : লরেন্স বারকেলী ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির প্রকৌশলীদের সাথে যৌথ উদ্যোগে লরেন্স লিভারমোর ন্যাশনাল ল্যাবরেটরির একদল বিজ্ঞানী এমন একটি মোবাইল সিস্টেম সম্প্রতি উদ্ভাবন করেছেন যা হোক নির্গত গামা-রশ্মির জন্য মানুষের শরীরে যাতে কোনো ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় সে লক্ষ্যে হেন্ড হেল্ড কুলেড ডারমেনিয়াম রেডিয়েশন-স্পেকটোমিটার যুক্ত করা হয়েছে। তরল নাইট্রোজেন ছাড়াই এই স্পেকটোমিটারটি কম শক্তির কম্পোক্ট মাইক্রোক্রাইকুলার দ্বারা যান্ত্রিক কৌশলে ঠাণ্ডা করা যায়। তাছাড়া হাই-লেভেলের এনার্জি রেজুলেশনও অর্জন সম্ভব।

বিজ্ঞানীরা নতুন উদ্ভাবিত এই স্পেকটোমিটারটির নামকরণ করেছেন ক্রাইও থ্রি। এটি এয়ার প্রুফ ছোট আকৃতির জারমেনিয়াম ডিটেক্টর, মাইক্রোকুলার এবং একটি কন্ট্রোলার সহযোগে তৈরি করা হয়েছে। যার ওজন মাত্র ১০ পাউন্ড। দু'টি রিচার্জেবল লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি দ্বারা একে প্রায় ৮ ঘণ্টা সচল রাখা যায়। হোমল্যান্ড সিকিউরিটির জন্য ক্রাইও থ্রি অত্যন্ত উপযুক্ত একটি এ্যাপ্লিকেশন্স। তরল নাইট্রোজেন সরবরাহ ছাড়াই পরীক্ষাগার পর্যায়ের ফলাফলের জন্য এটি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত জারমেনিয়াম কোয়ালিটির স্পেকট্রোকপি সুবিধা প্রদান করতে পারে। তাই মানুষের জন্য ক্ষতিকর রেডিয়েশন প্রতিরোধে একে নির্ভাবনায় ব্যবহার করা যায়।

৬. মশা ও ম্যালেরিয়া জীবাণুর জিন বিন্যাস আবিষ্কার : মানুষের বিশেষ করে প্রাণীদের জিন নিয়ে গবেষণায় সারা বিশ্বে যে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি সম্প্রতি সেক্ষেত্রে এক ব্যতিক্রমী ধারার সূচনা করেছেন জিন গবেষকরা। তারা এবার মশা এবং ম্যালেরিয়া-জীবাণুর জিন গবেষণা শুরু করেছেন। শুধু তাই নয় এক্ষেত্রে তারা ইতোমধ্যে বেশ সাফল্য অর্জন করেছেন। গত ৬ বছর যাবত পরিচালিত এই গবেষণার মাধ্যমে এই গবেষকরা রক্তশোষক মশা 'এনোফিলিস গ্যাম্বি' এবং ম্যালেরিয়া সৃষ্টিকারী পরজীবী প্লাজমোডিয়াম ফলস্পিরাস-এর ডিএন'র বিন্যাস জানতে পেরেছেন। এরপর এই বিজ্ঞানীরা বলেছেন এই জিন সিকোয়েন্সের মাধ্যমে ম্যালেরিয়া নিরাময় এবং প্রতিরোধে আরো কার্যকর ওষুধ ও মশানাশক তৈরি করা সম্ভব হবে।

বিশেষ করে গ্রীষ্মপ্রধান দরিদ্র দেশগুলোতে যেভাবে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে প্রতিবছর লাখ লাখ (১০ লাখ) লোক মারা যায় অতিদ্রুত এই জিন বিন্যাস ব্যবহার করে সেসব দেশে কার্যকর প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা যাবে।

বিজ্ঞানীদের এই গবেষণা রিপোর্ট প্রকাশ পাবার পর যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞান বিষয়ক গণমাধ্যগুলোতে নতুন করে আবার সমালোচনার ঝড় উঠেছে।

ইতোমধ্যে অনেকেই বিজ্ঞানীদের এই গবেষণাকর্মকে স্বাগত জানিয়েছেন। আবার কেউ কেউ সমালোচনা করলেও দ্রুত নতুন এই প্রযুক্তির বাস্তবসম্মত প্রয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ এর ফলে এই প্রযুক্তি যেমনি বাস্তবতা পাবে তেমন মশার আক্রমণ প্রতিরোধে যেসব ওষুধ বর্তমানে ব্যবহৃত হয় এগুলোর দ্বারা এই জনআহতকর পরিস্থিতির শিকার থেকে মানুষ রেহাই পাবেন। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

বক্তব্য উপস্থাপনের যুগোপযোগী ও আধুনিক পদ্ধতি

-শাইখ মুহাম্মদ এহসানুল্লাহ★

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾

"এবং কথায় তার চেয়ে উত্তম কে আছে যে মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকে, সৎ কর্ম করে এবং বলে, নিশ্চয়ই আমি মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত।"[১০৯]

এই আয়াত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, সৎ ও গ্রহণযোগ্য কথার শক্তি কেবল শোনার আনন্দ নয়; বরং মানুষের মনকে আলোকিত করে। বক্তৃতা বা বক্তব্যের প্রকৃত সৌন্দর্যও ঠিক এই শক্তিতে নিহিত। মানুষকে আকৃষ্ট করা, মন জাগানো এবং হৃদয় স্পর্শ করাই হলো আসল বক্তব্যের লক্ষ্য।

১. যথাযথ প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা : প্রতিটি মহান বক্তার সফলতার পেছনে থাকে পরিকল্পনা। প্রস্তুতি ছাড়া বক্তৃতা নদীর জলরাশির মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায়। যদি আপনি একটি বিষয় নিয়ে দাঁড়ান কিন্তু তার গভীরতা জানেন না, শ্রোতার মনে কৌতূহল জন্মে না। তাই পূর্বপরিকল্পনা অপরিহার্য। নোট লেখা, বিষয়ভিত্তিক গবেষণা ও মূল পয়েন্টগুলোর সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা বক্তৃতাকে সুসংগঠিত করে। দ্বীনের কাজে যখন বক্তব্য দেয়া হয়, তখন বিষয়বস্তু যথাযথ না হলে বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ন হয়। প্রস্তুতি হলো সেই প্রাথমিক সোপান, যা ছাড়া কোনো বক্তব্য মাটিতে ঠেকে, আকাশে উড়ে যায় না।

২. সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক সম্বোধন : শ্রোতার হৃদয়কে স্পর্শ করতে দীর্ঘ সম্বোধনের প্রয়োজন নেই। সংক্ষিপ্ত ও প্রাসঙ্গিক সম্বোধন মানুষের মনোযোগ ধরে রাখে এবং বক্তাকে মূল বক্তব্যে দ্রুত পৌঁছানোর সুযোগ দেয়। সময় সীমিত হলে দীর্ঘ সম্বোধন শ্রোতার আগ্রহ নষ্ট করে। কিছুটা ভদ্রতা, কিছুটা বিনয়। এটি হলো সম্বোধনের পরম সৌন্দর্য।

৩. আকর্ষণীয় ভূমিকা : ভূমিকা হলো বক্তৃতার প্রবেশদ্বার। শুষ্ক পরিচিতি নয়; বরং গল্প, চমকপ্রদ উদাহরণ বা কোনো বিস্ময়কর তথ্য দিয়ে শুরু করলে শ্রোতার চোখ ঝলমল করে। গল্পের মধ্যে যেভাবে চরিত্র, আবেগ ও সংকট প্রদর্শিত হয়, ঠিক তেমনি বক্তার শুরুতে দেওয়া উদাহরণ শ্রোতার মনকে গ্রহনযোগ্যতা, কৌতূহল ও আগ্রহের ছোঁয়া দেয়। এটি শুধুই মনোরঞ্জন নয়; বরং মনোযোগ ধরে রাখার এক শিল্প।

৪. ধীরে ধীরে মূল বক্তব্যের দিকে আগানো : বক্তব্য যেন একটি সুসংগঠিত ভ্রমণের মতো। প্রথমে হালকা "স্টার্টার", পরে ভারী "মূল বিষয়" এবং শেষে মধুর "উপসংহার"। শ্রোতার মনকে প্রস্তুত না করে জটিল বিষয় শুরু করা মানে তাদেরকে বিক্ষুব্ধ করা। ব্যাখ্যার এই ধারা এক প্রকার রুচিশীলতা এবং মনোবৈজ্ঞানিক কৌশল। বিশেষ করে যখন শ্রোতার বয়স, শিক্ষা ও মান ভিন্ন, তখন এই পদ্ধতি বক্তৃতাকে গ্রহণযোগ্য ও সহজবোধ্য করে তোলে।

৫. শ্রোতাদের সঙ্গে প্রশ্ন ও সংলাপ : শ্রোতার সক্রিয় অংশগ্রহণ বক্তৃতার প্রাণ। মাঝে মাঝে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেওয়া, গল্পের মাধ্যমে সংলাপ তৈরি করা, বা তাদের অভিমত নেওয়া বক্তৃতার শক্তি দ্বিগুণ করে। এটি একঘেয়েমিতা দূর করে এবং বক্তার প্রতি শ্রোতার মনোযোগ জাগ্রত রাখে। গবেষণায় দেখা গেছে, সক্রিয় অংশগ্রহণ বক্তৃতার গ্রহণযোগ্যতা প্রায় ২০-৩০% বৃদ্ধি করে। এটি শুধুই শৈলী নয়, এটি শ্রোতার মনোযোগ ধরে রাখার কার্যকর কৌশল।

৬. বাচনভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি ও আই-কন্টাক্ট : শ্রোতার সঙ্গে চোখের সংযোগ, হাতের ব্যবহার, দেহভঙ্গি -সবই বক্তব্যকে জীবন্ত করে তোলে। জন এফ কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং বা স্টিভ জবসের বক্তৃতার যাদু এখানে প্রতিফলিত। সহজভাবে বললে, বাক্য বলার সময় বাচনভঙ্গি ও অঙ্গভঙ্গি ব্যবহার করলে শ্রোতা বক্তার ভাবনা স্পর্শ করে। এটি বক্তাকে কেবল তথ্য প্রদানকারী নয়; বরং প্রভাবশালী ও প্রাঞ্জল শিল্পীর ভূমিকা দেয়।

৭. কণ্ঠের ওঠানামা : কণ্ঠের স্বর উচ্চ-নিম্ন করা বক্তৃতার আবেগ ও গম্ভীরতা বাড়ায়। কখনো আবেগময়, কখনো বলিষ্ঠ, কখনো উচ্ছল- এভাবে কণ্ঠ ব্যবহার শ্রোতার

★ *সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, যশোর জেলা শাখা।*

[১০৯] *সূরা হা-মীম, আস্ সাজদাহ্/ফুস্সিলাত : ৩৩।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

অনুভূতিতে সঞ্চারিত হয়। নবী মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর খুতবার উদাহরণ অনুপম। প্রয়োজনে আবেগময় কণ্ঠে কথা বলতেন, কখনো চোখে অশ্রু, কখনো বলিষ্ঠ কণ্ঠে ভাষণ দিতেন। শ্রোতার হৃদয় তখন কাঁপত। কণ্ঠ হলো বক্তার ভাব প্রকাশের রঙ, যা শ্রোতার মনকে জীবন্ত করে তোলে।

৮. শ্রোতার আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন : বক্তার প্রভাব নির্ভর করে বিষয় নির্বাচনেও। পরিবেশ, অনুষ্ঠান ও শ্রোতার আগ্রহ অনুযায়ী বিষয় নির্বাচন করতে হবে। উদাহরণ : রমাযানের ইফতার অনুষ্ঠানে রোযা বা ইসলামের প্রাসঙ্গিক আলোচনা শ্রোতার কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। অন্য কোনো বিষয় নির্বাচন করলে বক্তৃতা কার্যকর হয় না; বরং বিরক্তির কারণও হতে পারে। শ্রোতার আগ্রহের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় নির্বাচন বক্তৃতাকে কার্যকর ও প্রভাবশালী করে।

৯. শ্রোতার মান ও স্তর অনুযায়ী ভাষা : শ্রোতার শিক্ষা, বয়স, সামাজিক ও মানসিক স্তর অনুযায়ী ভাষা ও উদাহরণ নির্বাচন করা জরুরি। শিক্ষিত-অশিক্ষিত বা ছোট-বড় শ্রোতার জন্য একই ভাষা ব্যবহার করলে বক্তব্যের প্রভাব কমে। ছাত্রদের জন্য কঠিন ভাষা ব্যবহার বক্তৃতাকে অস্পষ্ট ও গ্রহণযোগ্যতা কমায়। তাই ভাষা ও উদাহরণ নির্বাচনে শ্রোতার স্তরকে মাথায় রাখতে হবে।

১০. ভাষার সৌন্দর্য ও শুদ্ধতা : ভাষার সৌন্দর্য বক্তৃতার প্রাণ। সাধু-চলিত শব্দ, অশুদ্ধ উচ্চারণ বা আঞ্চলিকতা এড়িয়ে চললে বক্তৃতার মান বৃদ্ধি পায়। নরম, স্পষ্ট, প্রাঞ্জল ও ভদ্র ভাষা শ্রোতার মনকে আকৃষ্ট করে। আল্লাহ প্রদত্ত মাতৃভাষা সুন্দরভাবে ব্যবহার করা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রশংসনীয়। ভাষার এই সৌন্দর্য শ্রোতার হৃদয়ে গভীর ছাপ ফেলে।

উপসংহার : বক্তৃতা কেবল তথ্য প্রদান নয়, এটি একটি শিল্প। ভালো বক্তা হওয়ার জন্য প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা অপরিহার্য। শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করতে অঙ্গভঙ্গি, কণ্ঠ ও ভাষা ব্যবহার করতে হবে। শ্রোতার মান, আগ্রহ ও পরিবেশ অনুযায়ী বক্তব্য উপস্থাপন করতে হবে। দ্বীনের বক্তৃতা বা দায়ী ইলাল্লাহর কাজের ক্ষেত্রে আরো বিস্তারিত জ্ঞান ও সমসাময়িক সচেতনতা প্রয়োজন। শ্রোতার মন স্পর্শ করা, তাদের হৃদয়ে ছাপ ফেলা এবং বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্য সফল করা– এটাই বক্তার চূড়ান্ত লক্ষ্য। যে বক্তা এই দশটি দিক অনুসরণ করে, সে কেবল তথ্য দেয় না; বরং মানুষের মনকে আলোকিত করে, তাদের চিন্তাভাবনা ও জীবনকে প্রভাবিত করে। ☒

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স : মোঙ্গলদের...

[৪১ পৃষ্ঠার পরের অংশ]

শাম সাগরের উপকূলীয় চারটি ক্রুসেডরাজ্যের মধ্যে দু'টিকেই (এন্টিয়ক, সিলিসিয়া) মামলুক সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। বাকি দু'টির মধ্যে একটির (জেরুসালেম) অধিকাংশ, অপরটির (ত্রিপোলি) কিয়দংশ দখলে নিয়ে আসেন। প্রচণ্ড গতিময় মোঙ্গল তুফানের কার্যকর প্রতিরোধ করেন। আইন জালুত, হিমস, আলবিস্তানসহ ক্রমাগত অসংখ্য যুদ্ধের মাধ্যমে ইলখানি মোঙ্গলদের কোমর ভেঙে দেন। বিশ্বত্রাস হাশাশিন গুপ্তঘাতকদের সমূলে উচ্ছেদ করেন। এছাড়াও আরো অজস্র সুকীর্তিতে মুসলিম ইতিহাসে অনেক বীরের ভিড়ে আলাদা মাহাত্ম্যে সদা জ্বলজ্বল করছে তাঁর নাম।

সুলতান বাইবার্স সম্পর্কে তিনটি বিশেষ মূল্যায়ন

১. ইমাম জাহাবি বলেন, সুলতান বাইবার্স ছিলেন একজন যোদ্ধা ও মুজাহিদ। তিনি ছিলেন জনদরদি। যদি তাঁর মধ্যে যুল্মের বিষয় না থাকত, তাহলে তিনি ন্যায়বিচারক শাসক হিসেবে গন্য হতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে ক্ষমা করুক। ইসলামের ইতিহাসে তিনি উজ্জ্বল অধ্যায় স্থাপন করেছেন।[১১০]

২. ইবনু কাসির বলেন, সুলতান বাইবার্স ছিলেন সাহসী। ইসলামকে সাহায্য করার বিশুদ্ধ ইচ্ছা তিনি লালন করতেন। তিনি সকল মাজহাবের কাজি নিযুক্ত করেছিলেন। রাজ্য থেকে সকল অপকর্ম দূর করেছিলেন। তিনি ইসলাম ও মুসলিমদের তাতার ও ক্রুসেডারদের হাত থেকে রক্ষা করেন।[১১১]

৩. ইবনু তাগরি বারদি বলেন, সুলতান বাইবার্সের অন্যান্য গুণের পাশাপাশি তাঁর একটি বিশেষ গুণ ছিল তিনি ইতিহাস ও ইতিহাসবিদদের পছন্দ করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, ইতিহাস শোনা মানে বিশাল অভিজ্ঞতা অর্জন করা।[১১২]

পরিশেষে একটি কথা বলবো, মুসলিম উম্মাহর সাহায্যকারী ইসলামের একজন বীর হওয়া সত্ত্বেও বাইবার্স সম্পর্কে জানা লোকের সংখ্যা একেবারে নগন্য। কেননা বাংলাসাহিত্য, ইতিহাসে তাকে নিয়ে আলোচনা হয় না তেমন। আমাদের বেশি বেশি মুসলমানদের বিজয়গাঁথা ইতিহাস পড়া ও জানা উচিত। ☒

[১১০] *আল-ইবার ফি আখবারি মান গাবার- ৫/৩০৮।*
[১১১] *আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- ১৩/২৭৫।*
[১১২] *আন-নুজুমুজ জাহিরা- ৭/১৭৭।*

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে রাগ নিয়ন্ত্রণ, ক্ষমাশীলতা ও উত্তম চরিত্র

-মো. মনিরুজ্জামান★

[তৃতীয় (শেষ) পর্ব]

২৬. ভাই-বোন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রাগের কারণে ভাঙা যাবে না : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللهِ مِن بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ﴾

"যারা আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে এবং সম্পর্ক ছিন্ন করে, তাদের জন্য আছে অভিশাপ ও নিকৃষ্ট আবাস।"[১১৩]

তাফসীর : এখানে আত্মীয়তা ছিন্ন করা বড় কবীরা গুনাহ। অনেক সময় রাগ ও অভিমান থেকেই এ সম্পর্ক ভেঙে যায়। ইসলাম এই রাগকে কাটিয়ে উঠতে বলে।

হাদীস : রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"[১১৪]

ব্যাখ্যা : আত্মীয়দের সাথে রাগ-অভিমান দীর্ঘায়িত নয়; ক্ষমা করে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখা ফর্‌য কর্তব্য।

২৭. পারিবারিক সিদ্ধান্তে রাগ নয়, পরামর্শ (শূরা) : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَأَمْرُهُمْ شُوْرَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

"তাদের কাজ পরামর্শের মাধ্যমে হয়।"[১১৫]

তাফসীর : পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে রাগের আবেগে সিদ্ধান্ত নিলে ক্ষতি হয়; তাই আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের বৈশিষ্ট্য করেছেন– "তাদের সিদ্ধান্ত হয় শূরার মাধ্যমে।"

হাদীস : হুদায়বিয়ার ঘটনায় নবী (ﷺ) উম্মে সালামা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)-এর পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন এবং তা শান্তিপূর্ণ সমাধান এনেছিল।[১১৬]

বার্তা : পারিবারিক বিষয়ে রাগ করে সিদ্ধান্ত না নিয়ে, পরামর্শের ভিত্তিতে সমাধানই সুন্নাহ।

২৮. রাগের সময় সন্তানকে শাসন না করা : রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "তোমাদের কেউ রাগের অবস্থায় বিচার/সিদ্ধান্ত দেবে না।"[১১৭]

শাসন যদি রাগের কারণে হয়, তবে তা শয়তান প্রভাবিত। ইসলামে শাসন শিক্ষা ও সংশোধনের জন্য, রাগের বহিঃপ্রকাশের জন্য নয়।

বার্তা : সন্তানকে শাসন দরকার হলে শান্ত অবস্থায় দিতে হবে; রাগের সময় শাসন ন্যায়সঙ্গত হয় না।

২৯. ঘরে দু'আ ও যিক্‌রের মাধ্যমে রাগ কমানো : আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ﴾

"যারা রাগ সংবরণ করে ও মানুষকে ক্ষমা করে– আর আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালোবাসেন।"[১১৮]

এ আয়াতে রাগ সংবরণ ও ক্ষমা দু'টো একসাথে করা হয়েছে। কারণ শুধু রাগ দমন করাই যথেষ্ট নয়; বরং ক্ষমা করাও দরকার।

হাদীস : রাসূল (ﷺ) বলেছেন, "যখন তোমাদের কারো রাগ আসে, সে যেন দাঁড়িয়ে থাকলে বসে যায়; বসে থাকলে শুয়ে যায়।"[১১৯]

বার্তা : পারিবারিক জীবনে রাগের সময়ে অবস্থান পরিবর্তন, ওযূ, দু'আ ও যিক্‌র কার্যকর সমাধান।

রাগ নিয়ন্ত্রণে নববী নির্দেশনা

১. রাগ করো না : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ (ﷺ) : أَوْصِنِيْ، قَالَ : «لَا تَغْضَبْ» فَرَدَّدَ مِرَارًا، قَالَ : «لَا تَغْضَبْ».

অর্থ : আবূ হুরাইরাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত– এক ব্যক্তি নবী (ﷺ)-কে উপদেশ চাইলে তিনি বললেন : "রাগ করো না।" লোকটি বারবার জিজ্ঞেস করলে, নবী (ﷺ) প্রত্যেকবার বললেন : "রাগ করো না।"[১২০]

নবী (ﷺ) বারবার একই উত্তর দিলেন– রাগ দমনই চরিত্র গঠনের মূল।

ইমাম ইবনু হাজর আসকালানী বলেন : এখানে শুধু রাগ না করার নির্দেশ নয়; বরং রাগ নিয়ন্ত্রণ করে গুনাহ থেকে বিরত থাকা বোঝানো হয়েছে।

★ সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক, জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, যশোর জেলা শাখা।

[১১৩] সূরা আর্-রা'দ : ২৫।
[১১৪] সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৫৬।
[১১৫] সূরা আশ্-শূরা- : ৩৮।
[১১৬] সহীহুল বুখারী- হা. ২৭৩১।
[১১৭] সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৫৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৭।
[১১৮] সূরা আ-লি-'ইমরান : ১৩৪।
[১১৯] সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৭৮২, সনদ সহীহ।
[১২০] সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আদব, হা. ৬১১৬।

সাহাবিরা বুঝেছিলেন, রাগ হলে সাধারণত কটু কথা, হাত তোলা বা সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়– তাই নবী (ﷺ)-এর শিকড়েই আঘাত করেছেন।

শিক্ষণীয় পয়েন্ট : → পরিবারে ঝগড়া শুরু হবার আগেই রাগ থামানো। → সমাজে বড় বিপদ থেকে বাঁচার প্রথম উপায়– নিজেকে নিয়ন্ত্রণ।

২. রাগ উঠলে আউযু বিল্লাহ পড়া : রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ قَالَ : اسْتَبَّ رَجُلَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ (ﷺ) وَنَحْنُ عِنْدَهُ جُلُوْسٌ، وَأَحَدُهُمَا يَسُبُّ صَاحِبَهُ مُغْضَبًا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ (ﷺ) : «إِنِّيْ لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ : أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ، ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ.

অর্থ : সুলায়মান ইবনু সুরাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন– দু'জন ব্যক্তি নবী (ﷺ)-এর সামনে ঝগড়া করছিল। একজন প্রচণ্ড রেগে লাল হয়ে যাচ্ছিল। তখন নবী (ﷺ) বললেন : "আমি এমন একটি বাক্য জানি, যদি সে বলে তবে রাগ কেটে যাবে। যদি বলে– 'আউযু বিল্লাহি মিনাশ-শাইতানির রাজীম', তবে তার রাগ দূর হয়ে যাবে।"[১২১]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন,

أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

অর্থ : "আমি বিতাড়িত শয়তান থেকে মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই।"[১২২]

রাগ শয়তানের প্ররোচনা। তাই প্রথম প্রতিরোধ– মহান আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া।

ইমাম নওয়াবী বলেন : এ দু'আ রাগকে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা করে দেয়, কারণ মনের দৃষ্টি আল্লাহর দিকে চলে যায়।

শিক্ষণীয় পয়েন্ট : → ঘরে-বাইরে ঝগড়া হলে প্রথমে "আউযু বিল্লাহ" বলতে হবে। → সন্তানদের শেখানো উচিত –রাগ উঠলে এই দু'আ পড়বে।

৩. রাগের অবস্থায় বিচার না দেওয়া : রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) : «لَا يَقْضِيَنَّ حَكَمٌ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ.

অর্থ : আবূ বক্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "কোনো বিচারক যেন রাগের অবস্থায় দুইজনের মধ্যে ফয়সালা না করে।"[১২৩]

রাগে মানুষের যুক্তি নষ্ট হয়– ন্যায় বিচার অসম্ভব।

ইমাম শাফেয়ী বলেন : শুধু বিচারক নয়, পরিবার প্রধান, শিক্ষক, নেতা –কারোই উচিত নয় রাগের মাথায় সিদ্ধান্ত নেওয়া।

শিক্ষণীয় পয়েন্ট : → বাবা-মা সন্তানকে রাগের মাথায় শাস্তি দিলে অন্যায় হয়। → পরিবার ও সমাজে ন্যায়বিচারের শর্ত হলো– রাগমুক্ত থাকা।

৪. ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নয় : রাসূল (ﷺ) আরো বলেন,

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) قَالَتْ : مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ (ﷺ) شَيْئًا قَطُّ بِيَدِهِ، وَلَا امْرَأَةً، وَلَا خَادِمًا، إِلَّا أَنْ يُجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ، وَمَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمَ مِنْ صَاحِبِهِ، إِلَّا أَنْ يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمَ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ.

অর্থ : 'আয়িশাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন– রাসূল (ﷺ) কখনো নিজের হাতে কিছু মারেননি, না নারী, না দাস। কেবল মহান আল্লাহর পথে জিহাদ ছাড়া। আর কেউ তার ব্যক্তিগত বিষয়ে কষ্ট দিলে তিনি প্রতিশোধ নিতেন না। তবে যদি মহান আল্লাহর কোনো বিধান লঙ্ঘিত হতো, তিনি মহান আল্লাহর জন্য প্রতিশোধ নিতেন।[১২৪]

এটি রাসূল (ﷺ)-এর চরিত্রের অনন্য দিক।

সাহাবিরা বলেন : শত্রু তাঁকে কষ্ট দিলেও তিনি ব্যক্তিগত প্রতিশোধ নেননি। কিন্তু মহান আল্লাহর হক্ব লঙ্ঘন হলে তিনি কঠোর হতেন।

শিক্ষণীয় পয়েন্ট : → পরিবারে স্বামী-স্ত্রী ছোট ভুলে ঝগড়া করবে না। → সমাজে ব্যক্তিগত মান-অভিমান নয়; বরং মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য হলে রাগ করা উচিত।

৫. রাগে সম্পর্ক ছিন্ন তিন দিনের বেশি নয় : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِيْ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) قَالَ : «لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا، وَخَيْرُهُمَا الَّذِيْ يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ.

অর্থ : আবূ আইয়ুব আনসারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত– রাসূল (ﷺ) বলেছেন : "কোনো মুসলিমের জন্য বৈধ নয় যে, সে তার ভাইকে তিন দিনের বেশি বয়কট করবে। দু'জন মিলিত হলে একজন মুখ ফিরিয়ে নেবে, অন্যজনও মুখ ফিরিয়ে নেবে। আর তাদের মধ্যে উত্তম সে-ই, যে আগে সালাম দেয়।"[১২৫]

---

[১২১] *সহীহুল বুখারী- কিতাবুল আদব, হা. ৬১১৫।*

[১২২] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬১১৫; সহীহ মুসলিম- হা. ২৬১০।*

[১২৩] *সহীহুল বুখারী- হা. ৭১৫৮; সহীহ মুসলিম- হা. ১৭১৭।*

[১২৪] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৩২৮; সহীহুল বুখারী- অর্থ কাছাকাছি।*

[১২৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০৭৭; সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬০।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

মানুষের স্বভাব রাগ করা; তাই ইসলাম তিন দিনের অবকাশ দিয়েছে।

ইমাম নববী বলেন : চতুর্থ দিনে সম্পর্ক জোড়া লাগানো ওয়াজিব।

শিক্ষণীয় পয়েন্ট : → পরিবার বা বন্ধুত্বে অভিমান দীর্ঘ করা হারাম। → যে আগে সালাম দেয়, সে-ই মহান আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ।

৬. উত্তম কথা বলা বা নীরব থাকা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ.

অর্থ : নবী (ﷺ) বলেছেন : "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন উত্তম কথা বলে অথবা নীরব থাকে।"[১২৬]

রাগের মুহূর্তে সর্বোত্তম সমাধান হলো– চুপ থাকা।

ইমাম ইবনু আব্দুল বার বলেন : চুপ থাকা অনেক ফেতনা থেকে বাঁচায়।

শিক্ষণীয় পয়েন্ট : → দাম্পত্য জীবনে রাগ উঠলে স্বামী-স্ত্রী কটু কথা নয়; বরং নীরব থাকবে। → নীরবতা কখনো কখনো 'ইবাদত।

৭. মুসলিমের পরিচয়– হাত ও জিহ্বা থেকে নিরাপদ রাখা : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ.

অর্থ : নবী (ﷺ) বলেছেন : "মুসলিম সে-ই, যার হাত ও জিহ্বা থেকে অন্যান্য মুসলিম নিরাপদ থাকে।"[১২৭]

প্রকৃত মুসলিম তার জিহ্বা ও হাত নিয়ন্ত্রণ করে।

রাগের সময়ই মানুষ জিহ্বা ও হাত দিয়ে অন্যায় করে ফেলে –এটা দমন করাই আসল ইসলাম।

শিক্ষণীয় পয়েন্ট : → পরিবারে কটু বাক্য বা মারধর কখনোই ইসলামের বৈশিষ্ট্য নয়। → সমাজে মারামারি বা অশ্লীল ভাষা ব্যবহারকারী আসল মুসলিম নয়, তার ঈমান দুর্বল।

আমরা সংক্ষেপে সাতটি পয়েন্ট বলতে পারি। সবগুলো হাদীসই সহীহ এবং এগুলো রাগ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ধাপে ধাপে শিক্ষা দেয়– **(১)** রাগকে প্রতিহত করা, **(২)** শয়তানের আশ্রয় থেকে বাঁচতে দু'আ করা, **(৩)** রাগে সিদ্ধান্ত না নেয়া, **(৪)** ব্যক্তিগত প্রতিশোধ থেকে বিরত থাকা, **(৫)** অভিমান দীর্ঘায়িত না করা, **(৬)** কটু কথা এড়িয়ে নীরব থাকা, **(৭)** জিহ্বা ও হাতের নিরাপত্তা বজায় রাখা।

উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোচনার ভিত্তিতে আমরা বলতে পারি–

১. "যে ব্যক্তি রাগের সময় ওযূ করে বা দু'আ করে, আল্লাহ তা'আলা তার রাগ নেভান।"[১২৮]

২. উপরোক্ত আলোচনার **ভালো দিক ও খারাপ দিক :**

ভালো দিক– ⇨ রাগ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষমা মানে ব্যক্তি এবং সমাজের জন্য কল্যাণ। ⇨ ধৈর্য ও সংযম আত্মিক শক্তি বৃদ্ধি করে। ⇨ ন্যায় ও সততার মান বজায় রাখে। ⇨ শত্রুতা ও দ্বন্দ্ব কমায়। ⇨ মহান আল্লাহর কাছে মর্যাদা ও ভালোবাসা অর্জন।

খারাপ দিক– ⇨ রাগে অল্প সময়ে কটু কথা বা প্রতিশোধ সমাজে বিভেদ সৃষ্টি করে। ⇨ ন্যায়পরায়ণতা হারানো ও অবিচারের দিকে ঝোঁক। ⇨ শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে গুনাহ ও ক্ষতি। ⇨ অহংকার ও অন্যায়ের প্রতি উদাসীনতা।

৩. এক নজরে মূল বিষয়– ⇨ রাগ নিয়ন্ত্রণ : রাগের মুহূর্তে ধৈর্য ধারণ। ⇨ ক্ষমাশীলতা : অপরাধের প্রতিশোধের চেয়ে ক্ষমা উত্তম। ⇨ ধৈর্য ও তাক্বওয়া : বিপদ ও প্রলোভনে স্থির থাকা। ⇨ সৌজন্যপূর্ণ আচরণ : কটু কথা ও বিরোধ এড়ানো। ⇨ ন্যায়ের প্রতি অটল থাকা : বিদ্বেষকে বিচারকে প্রভাবিত করতে না দেওয়া। ⇨ শয়তানের প্ররোচনা থেকে রক্ষা : আউযু বিল্লাহ ও দু'আ।

৪. মানুষের জন্য গঠনমূলক পরামর্শ– ⇨ রাগের সময় "আউযু বিল্লাহ" বলুন এবং নিজেকে স্থির রাখুন। ⇨ শত্রু বা ভুলকারীকে ক্ষমা ও সদাচরণ দেখান। ⇨ সমাজে শান্তি এবং সহযোগিতা বাড়াতে মৃদু ভাষা ও সৌজন্যপূর্ণ আচরণ করুন। ⇨ বিপদ ও পরীক্ষায় ধৈর্য ধরে তাক্বওয়া বজায় রাখুন। ⇨ ন্যায়ের পথে অটল থাকুন এবং বিদ্বেষকে নিজের সিদ্ধান্তে প্রভাবিত হতে দেবেন না। ⇨ নিয়মিত দু'আ ও স্মরণ করুন : আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সাহায্যকারী।

৫. সারসংক্ষেপ– ⇨ রাগ দমন ও ক্ষমাশীলতা মু'মিনের উচ্চ নৈতিক গুণ। ⇨ কেবল প্রতিশোধ নয়, ধৈর্য, ক্ষমা, সদাচরণ এবং সৌজন্য সামাজিক শান্তি প্রতিষ্ঠা করে। ⇨ শত্রুতা ও বিদ্বেষ থেকে মুক্ত থাকা। ⇨ ন্যায় প্রতিষ্ঠা করা এবং শয়তানের প্ররোচনা এড়ানো 'ইবাদতের অংশ। ⇨ এই গুণগুলো বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করলে মহান আল্লাহর ভালোবাসা, মর্যাদা এবং আখিরাতের কল্যাণ নিশ্চিত হয়।

আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন আমাদের সবাইকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জীবন পরিচালনা করার তাওফীক্ব দান করুন –আমিন। ☒

---

[১২৬] *সহীহুল বুখারী- হা. ৬০১৮; সহীহ মুসলিম- হা. ৪৭।*

[১২৭] *সহীহুল বুখারী- হা. ১০; সহীহ মুসলিম- হা. ৪০।*

[১২৮] *সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৩৩৮, আলবানী সহীহ।*

সূচীপত্র

নিভৃত ভাবনা

বই পড়ার কৌশল মনস্তাত্ত্বিক ও শিক্ষাগত বিশ্লেষণ

–আহমাদ বিন আব্দুস সালাম

লেখার ব্যাপারটা অইলো পুকুরে ঢিল ছোড়ার মতন। আপনি যত বড় ঢিল যত জোড়ে মারবেন পাঠকের মনে তরঙ্গটাও তত জোড়ে উঠবে, অধিকক্ষন থাকবে।[১২৯]

কোনো জাতিকে একটি সুনির্দিষ্ট আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে হলে সেই জাতির লোকদেরকে সুশিক্ষিত করে গড়ে তুলতে হবে। যখন তারা সেই আদর্শ অনুযায়ী তৈরি হবে তখনই একটি সফল সামাজিক বিপ্লব সাধন সম্ভব। মহানবী (ﷺ) মাত্র ২৩ বছরের মধ্যে জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন জাতিকে একটি বিশ্ববিজয়ী জাতিতে পরিণত করতে সক্ষম হন। আর এজন্য তিনি হেরা পর্বতের চূড়া থেকে নেমে আসা ইসলামের সর্বপ্রথম বাণী 'ইক্বরা'র পথ ধরেই সামনে অগ্রসর হয়েছিলেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿اِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِيْ خَلَقَ ۞ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۞ اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۞ الَّذِيْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۞ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ﴾

"পড়ো! তোমার প্রভুর নামে, যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। পড়ো এবং তোমার প্রতিপালক মহা সম্মানিত। যিনি কলমের মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছেন। যিনি মানুষকে শিক্ষা দিয়েছেন, যা সে জানত না।"[১৩০]

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) একটি সফল সমাজ বিপ্লব সাধনের জন্য সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দাঁড়িয়ে, কা'বা ঘরের চত্বরে দাঁড়িয়ে, উকাযের মেলা ঘুরে ঘুরে 'ইক্বরা' তথা পড়ার সবক দিয়েছিলেন। মহান আল্লাহর নবী হিসাবে তিনি ভালো করেই জানতেন সমাজের মানুষকে সুশিক্ষিত করতে না পারলে, তাদের নৈতিক চরিত্রের সংশোধন ও উন্নতি বিধান করতে না পারলে সমাজের মধ্যে বন্যার স্রোতের ন্যায় সম্পদের প্রবাহ সৃষ্টি হলেও তাতে মানুষের কোনো কল্যাণ সাধিত হবে না। সঠিক বিদ্যার্জন না করলে জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপকতা ও পরিপক্কতা আসবে না। তাই তো কুরআন ও হাদীসে জ্ঞান চর্চার উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوْا فِي الدِّيْنِ وَلِيُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوْا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُوْنَ﴾

"তাদের প্রত্যেক দলের একটি অংশ কেন বের হলো না, যাতে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং সংবাদ দান করে স্বজাতিকে, যখন তারা তাদের কাছে প্রত্যাবর্তন করবে, যেন তারা বাঁচতে পারে?"[১৩১]

মহানবী (ﷺ) বলেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ.

'জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয'।[১৩২]

জ্ঞান চর্চার ব্যাপারে ইসলামের উদার দৃষ্টিভঙ্গির অনন্য উদাহরণ পাওয়া যায় যুদ্ধ বন্দীদের ব্যাপারে মহানবী (ﷺ)-এর মহানুভবতা থেকে। হিজরতের দেড় বছর পর বদর যুদ্ধে প্রায় ৭০ জন মুশরিক বন্দী হয়। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক লোকের মুক্তিপণ দানের সামর্থ্য ছিল না। রাসূল (ﷺ) মদীনার ১০ জন করে ছেলেমেয়েকে শিক্ষাদানের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেন।[১৩৩] এই জ্ঞান অর্জনের একমাত্র পথ হলো "পড়া"। সলাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরয কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার ফরয বিধানের কোনো কিছুই প্রথমে নাজিল করেননি। সর্বপ্রথম নাজিল করেছেন "পড়"। তাই আজ আমরা বোঝার চেষ্টা করব কিভাবে পড়া যায় বা কিভাবে বই পড়তে হয়। যাকে ইংরেজিতে বলা যায়, How: o read a book?

আসুন একটি গল্প দিয়ে মূল আলাপে আসি। অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ মোসলেহ উদ্দীন শাহাদাত হোসেন খানকে একদা জিজ্ঞেস করলেন; "শাহাদাৎ বই পড়তে শিখেছ? বই পড়াও শিখতে হয়। বাজার থেকে বই ক্রয় করে এনে পড়ে ফেল্লেই তো পড়া হয়ে যায়, তাহলে আলাদা করে আবার– (১) পড়তে শেখার কি প্রয়োজন আছে?

---

[১২৯] *জ্ঞানতাপস– অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক।*

[১৩০] *সূরা আল-আলাক্ব : ১-৫।*

[১৩১] *সূরা আত্-তাওবাহ্ : ১২২।*

[১৩২] *মিশকা-তুল মাসা-বীহ- তাহক্বীক্ব : আলবানী, হা. ২১৮।*

[১৩৩] *বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষার ইতিহাস ও ঐতিহ্য- পৃ. ৬৯।*

(২) পড়াও কি শিখতে হয়? লেখক তোমাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, কোন কোন দিকগুলো লেখক সুক্ষ্মভাবে এড়িয়ে যাচ্ছেন, কোন দিকগুলোর দিকে বেশি জোড় দিচ্ছেন। এগুলো যদি ধরতে বা বুঝতে না পার, তাহলে বই কিভাবে পড়তে হয় তা শিখতে পারোনি এখনো।"

Read শব্দের অর্থ পড়া আর Studz শব্দের অর্থও "পড়া"। বাংলায় বা ইংরেজিতে দু'টা শব্দের অর্থ বর্ণামূলকভাবে একই ধারায় প্রকাশ করলেও বিশ্লেষণ মূলকভাবে দু'টি শব্দের মধ্যে অনেক বড় পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। আমরা আপাতত পড়া শব্দকে ধরে সামনে আগাই। বই পড়ার দুইটা পদ্ধতি আছে– (ক) বর্নামূলক পাঠ, (খ) তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ মূলক পাঠ।

ধরুন আপনি ও আপনার সদ্য বাংলা বানান শেখা সন্তান শাহাবাগ থেকে হেটে যাচ্ছে, দেখতে পেলেন শাহাবাগের দেয়ালে দেয়ালে লেখা রয়েছে; "মুহাম্মাদ (ﷺ)"। আপনার সন্তান বানান করে শব্দটি পড়ে ফেলবে কিন্তু আপনি যখন এই শব্দটি পড়বেন তখন নিশ্চয়ই আপনার মাথায় প্রশ্ন এবং তত্ত্ব আসবে। শুরুতেই শব্দটা পড়ার পরেই আপনার মাথায় ভেসে আসবে তিনি আমাদের শেষ নবী, যিনি সর্বকালের সর্ব শ্রেষ্ঠ মানব, যিনি পৃথিবীতে সর্বাকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সৃষ্টি করে পৃথিবীতে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে ন্যায় ও ইনসাফের রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর আপনার মস্তিষ্ক প্রশ্ন করবে শাহাবাগের মতো নাস্তিকদের আড্ডাখানায় এই মহামানবের নাম কেন? নিশ্চয়ই এখানে কোনো ডানপন্থি আন্দোলন সংঘটিত হয়েছে।

এই উদাহরণটি অনেকের কাছে কঠিন লাগতে পারে আসুন আরেকটি সহজ উদাহরণ দেই। "H2O" আমরা জানি এটি পানির রাসায়নিক সংকেত। এই শব্দটা যদি আপনার সন্তানকে পড়তে বলেন সেও পড়তে পারব, সে পড়ে ফেলবে H 2 O, কিন্তু আপনি পড়বেন "পানি"। এটাই হলো বর্ণামূলক আর বিশ্লেষণমূলক পাঠ।

পুরো দুনিয়া জুড়ে তারাই দীর্ঘ মেয়াদি আধিপত্য বিস্তার করে যারা অক্ষরকে বিশ্লেষণ মূলকভাবে পাঠ করতে পারে। আপনার চিন্তা ভাবনা এবং মস্তিষ্ককে নিয়ন্ত্রণ করার একমাত্র উপায় হলো– "Text"। পাশ্চাত্য থেকে পড়ে আসা এবং প্রাচ্য থেকে পড়ে আসা মানুষের দিকে খেয়াল করলে দেখতে পাবেন তাদের মধ্যে চিন্তার এবং বুঝের অনেক বড় একটা পার্থক্য আছে। এটার অন্যতম কারণ হলো পড়া। যিনি যেই ধাচের অধ্যায়ন করেন তার মস্তিষ্ক সেই ধাচেই প্রবাহিত হয়। তাই একটি বইকে সাধারণভাবে নেয়ার কোনো সুযোগ নেই। "মস্তিষ্কের বিপ্লব, দুনিয়ার সব চেয়ে বড় বিপ্লব।" তাই আপনার মস্তিষ্ক কোন পথে হাটবে বা আপনার সমাজ কোন দিকে প্রবাহিত হবে তা নির্ভর করে কোন ধরনের বই অধ্যায়ন করা হচ্ছে তার উপর। জ্ঞানতাপস জাতীয় অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব তার শীর্ষ লেখক আহমদ সফাকে বলেছিলেন; "যখন কোনো নতুন জায়গায় যাইবেন, দু'টা বিষয় পয়লা জানার চেষ্টা করবেন। (১) কাচা বাজারে যাইবেন, কি খায় এইডা দেহনের লাইজ্ঞা। (২) বই এর দোকানে যাইবেন পড়াশোনা কি করে হেইডা জানার লাইজ্ঞা। কি খায়, কি পড়ে দুইডা জিনিস না জানলে একটা জাতির কোনো কিছু জানন যায় না।"[১৩৪]

পাঠক দুই ধরনের– (১) সচেতন পাঠক, (২) অচেতন পাঠক। সচেতন পাঠক যখন একটি বই অধ্যায়ন করেন তখন তিনি লেখক কে বা বই কে প্রশ্নের মধ্যে দিয়ে পাঠ এগিয়ে নেন। যা আমরা বিখ্যাত SQRRR মডেল এর মধ্যে দেখতে পাই। সচেতন পাঠক কোনোভাবেই তাড়াহুড়ো করে পাঠ করে না। কারণ তাড়াতাড়ি পড়লে অনেক কিছুই ধোয়াসা রয়ে যায়। কার্যকরভাবে বই পড়া শুধুমাত্র অক্ষর চেনা বা তথ্য আহরণ নয়; বরং এটি একটি সুসংগঠিত মানসিক এবং শিক্ষাগত প্রক্রিয়া। এই বিশ্লেষণে প্রমাণিত হয় যে, নিষ্ক্রিয় পাঠ (Passive Reading) পরিহার করে সক্রিয়ভাবে জ্ঞান আহরণের জন্য পাঠককে তিনটি মূল স্তম্ভের উপর মনোযোগ দিতে হবে– নিয়মিত পঠন অভ্যাস গঠন, সক্রিয় পঠন কৌশল প্রয়োগ এবং বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্মৃতিতে তথ্য ধারণ করা। এই কৌশলগুলোর মধ্যে আমেরিকার শিক্ষা দার্শনিক ফ্রান্সিস পি. রবিনসন (Francis P. Robinson) প্রবর্তিত SQ3R মডেল বেশ জনপ্রিয়। সফল পাঠক হওয়ার মূল চাবিকাঠি হলো পড়ার উদ্দেশ্য অনুযায়ী বিশ্লেষণ মূলক বই নির্বাচন এবং জ্ঞানীকে সুনির্দিষ্টভাবে যৌক্তিক প্রশ্ন করা। আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; "পড়নের সময় তাড়াহুড়ো কইরেন না। কী পড়ছেন হেইডা পরিষ্কারভাবে বুঝার চেষ্টা করবেন।"

---

[১৩৪] *যদ্যপি আমার গুরু*- ২১-২২ পৃ.।

পঠনের গুরুত্ব, দক্ষতার সংজ্ঞা এবং শারীরিক-মানসিক প্রস্তুতি : পঠন দক্ষতার সংজ্ঞা অনুযায়ী, এটি কেবল কোনো লিখিত বিষয়বস্তুকে নির্ভুলভাবে পড়ে যাওয়া নয়; বরং সেটির অর্থ বোঝা, গভীরভাবে উপলব্ধি করা এবং সেই বিষয়বস্তুকে অন্যের উপলব্ধির উপযোগী করে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করার সক্ষমতা। কার্যকর পঠনের প্রথম ধাপ হলো মানসিক আগ্রহ সৃষ্টি করা। বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাঠক বই কে তার প্রিয় বস্তু (খেলাধুলা, গল্প, আড্ডা)'র প্রতি আগ্রহের সাথে তুলনা করে পড়ার প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে এবং 'পড়া কঠিন', 'মনে থাকে না' –এই ধরনের নেতিবাচক ধারণাগুলো থেকে মনকে মুক্ত করে 'খালি মাথায়' বসতে হবে। যখন মস্তিষ্কে ইতিবাচক উদ্দীপনা তৈরি হয়, তখন পড়ার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। বই পড়ার জন্য একটি আরামদায়ক ও কোলাহলহীন স্থান খুঁজে বের করা জরুরি।

দীর্ঘস্থায়ী পঠন অভ্যাস গঠনের জন্য কিছু ব্যবহারিক কৌশল কার্যকর। এর মূল উদ্দেশ্য হলো পড়ার সাথে জড়িত মানসিক চাপ বা 'ঘর্ষণ' (Friction) কমিয়ে আনা। পাঠক যখন ক্রমাগত অপ্রয়োজনীয় চাপের সম্মুখীন হন (যেমন খারাপ লাগা সত্ত্বেও একটি বই শেষ করার তাগিদ), তখন তার পড়ার আগ্রহ দ্রুত হ্রাস পায়। দ্বিতীয়ত, পাঠক যেখানেই যান, সাথে একটি বই (হার্ডকভার, পিডিএফ, বা অডিওবুক) নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত, যাতে অপ্রত্যাশিত বিরতির সময়ও পড়া চালিয়ে যাওয়া যায়। এই ধারাবাহিকতা অভ্যাসটিকে আরো শক্তিশালী করে। তৃতীয়ত, যে বইগুলো পড়তে ভালো লাগছে না, সেগুলো পড়তে হবে এমন চাপ না নিয়ে ছেড়ে দেওয়া উচিত। পছন্দের টপিকের বই বেছে নেওয়ার মাধ্যমে আগ্রহ অটুট থাকে। সবশেষে, বইপ্রেমীদের সাথে মেলামেশা করে নতুন বই সম্পর্কে জানা এবং পঠিত বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই সামাজিক আলোচনাগুলো জ্ঞানকে আরো সুসংহত করে এবং পাঠককে নিরন্তর শেখার প্রেরণা যোগায়। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; "পড়ার ব্যাপারটা অইলো অন্যরকম। আপনে যখন মনে করলেন কোন বই পইড়্যা ফেলাইছেন নিজেরে জিগাইবেন, যে বইটা পড়ছেন নিজের ভাষায় আবার বইটা লিখতে পারবেন কিনা। আপনের ভাষার জোড় লেখকের মতো শক্তিশালী না অইতে পারে, আপনের শব্দ ভাণ্ডার সামান্য অইতে পারে, তথাপি যদি মনে মনে জিনিসটা রিপ্রোডিউস না করতে পারেন। ধইর্যা নিবেন আপনের পড়া অয় নাই।[১৩৫]

SQ3R মডেল : সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং প্রমাণিত মডেল হলো SQ3R (বা SQRRR)। এই পদ্ধতিটি ফ্রান্সিস পি. রবিনসন কর্তৃক ১৯৪৬ সালে তার 'ইফেক্টিভ স্টাডি' (Effective Studz) বইয়ে প্রবর্তিত হয় এবং এটি পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু দক্ষ ও কার্যকরভাবে পড়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। SQ3R মডেলে পাঁচটি প্রধান ধাপ রয়েছে, যা পাঠককে পঠন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে সচেতনভাবে যুক্ত রাখে।

SQ3R মডেলের কার্যকরী ধাপসমূহ– ধাপ (Step) সংজ্ঞা (Definition) উদ্দেশ্য (Purpose) করণীয় (Actionable Steps) সমীক্ষা (Survey) সম্পূর্ণ অধ্যায় বা বইয়ের উপর দ্রুত চোখ বুলানো কাঠামোগত ধারণা তৈরি ও মানসিক প্রস্তুতি ভূমিকা, শিরোনাম, ছবি, চার্ট, সারাংশ দেখে নেয়া।

প্রশ্ন (Question) শিরোনাম ও উপশিরোনাম থেকে প্রশ্ন তৈরি করা মনোযোগ বৃদ্ধি ও উত্তর খোঁজার উদ্দীপনা সৃষ্টি "কী?", "কেন?", "কীভাবে?" "কি জন্য?" "কি কারণে" ইত্যাদি প্রশ্নগুলো মনে তৈরি করা।

পঠন (R1-Read) মনোযোগ সহকারে পাঠ করা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা ও মূল ধারণা বোঝা ধীর ও বোধগম্য গতিতে পড়া, সক্রিয়ভাবে হাইলাইট করা।

আবৃত্তি/স্মরণ (R2-Recite) চোখ বন্ধ করে বা নিজের ভাষায় মূল বিষয়টি মস্তিষ্কে ধারন করা। ধারণক্ষমতা যাচাই এবং তাৎক্ষণিক স্মৃতিতে প্রবেশ করানো। নোট না দেখে বা মুখস্ত না করে মূল বিষয়বস্তু স্মরণ করা বা লিখে ফেলা।

পর্যালোচনা (R3-Review) বিরতি দিয়ে পুনরালোচনা দীর্ঘমেয়াদি স্মৃতিতে জ্ঞানকে গেঁথে দেওয়া পূর্বের নোট ও দাগানো অংশগুলো বিরতি দিয়ে পুনরায় পড়া।

ফিকশন বনাম নন-ফিকশন : পাঠ্য বিষয়ের প্রকৃতি অনুযায়ী পাঠকের কৌশলগত পার্থক্য দেখা যায়। যদি একজন পাঠক ফিকশন বা বিনোদনমূলক পাঠকে নন-ফিকশনের মতো তীব্র জ্ঞানীয় চাপ দিয়ে পড়েন, তবে

[১৩৫] *যপদ্যপি আমার গুরু- ২৬ পৃ.।*

তিনি দ্রুত মানসিক অবসাদে ভুগতে পারেন। নন-ফিকশন বইগুলো সাধারণত বাস্তবধর্মী হয়ে থাকে এবং এর মূল উদ্দেশ্য পাঠককে কোনো বিষয়ে অবহিতকরণ ও জ্ঞান বৃদ্ধি করা। এই বইগুলোর মধ্যে রয়েছে আত্ম-উন্নয়নমূলক বই, ইতিহাস সম্পর্কিত বই, টাইম ম্যানেজমেন্টের বই, বা বিজনেস সংক্রান্ত লেখা। যেহেতু নন-ফিকশনের মূল লক্ষ্য জ্ঞান বৃদ্ধি, তাই এই ধরনের পাঠের ক্ষেত্রে SQ3R মডেল এবং ফাইনম্যান কৌশলের মতো তীব্র ধারণক্ষমতা নির্ভর পদ্ধতি ব্যবহার করা অত্যাবশ্যক। পাঠককে অবশ্যই নতুন ধারণা ও দৃষ্টিকোণ খুঁজে বের করতে হবে এবং এই ধরনের বইকে একটি বুদ্ধিবৃত্তিক চ্যালেঞ্জ হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

ফিকশন বই মূলত কল্পনাকেন্দ্রিক। লেখকের নিজস্ব কল্পনার ফল হলো ফিকশন এবং এর মূল উদ্দেশ্য থাকে পাঠককে আনন্দ প্রদান ও কল্পনা শক্তির বিকাশ ঘটানো। ফিকশনের ব্যাখ্যা পাঠক ভেদে ভিন্নতা লাভ করতে পারে। ফিকশন পড়ার কৌশলগত নমনীয়তা থাকা উচিত। পাঠককে কোনো বই শেষ করতেই হবে এমন চাপ না নিয়ে, নিজের পছন্দমতো চ্যাপ্টার বা পৃষ্ঠাগুলো পড়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ফিকশন পড়ার ক্ষেত্রে গভীর ধারণ বা আবৃত্তির চেয়ে গল্পে নিমগ্নতা (Immersion) অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কৌশল নির্বাচন অবশ্যই উদ্দেশ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে; ফিকশনে আনন্দের জন্য পড়া উচিত এবং নন-ফিকশনে জ্ঞান অর্জনের জন্য।

জার্মান মনোবিদ হারমান এবিনঘসের গবেষণায় দেখা যায়, যেকোনো কিছু পড়ার এক ঘণ্টা পর সেটির মাত্র ৪৪ শতাংশ আমাদের মনে থাকে। এই দ্রুত ভুলে যাওয়ার রেখা অতিক্রম করার জন্য তাৎক্ষণিক রিভিশন না দিয়ে, একটি নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে একই বিষয় আবার পড়া প্রয়োজন। ব্যবধানযুক্ত পুনরাবৃত্তি কৌশল এই নীতি অনুসরণ করে। এই পদ্ধতি অনুযায়ী, পাঠককে ভুলে যাওয়া শুরু হওয়ার ঠিক মুহূর্তে নিজেকে চ্যালেঞ্জ জানাতে হয় এবং এই বিরতি বা ফাঁকা স্থানগুলো ক্রমশ বাড়তে থাকে। গবেষণায় প্রমাণিত হয় যে, এই পদ্ধতি মস্তিষ্কের জন্য কিছুটা কঠিন বা হতাশাজনক মনে হলেও, এটিই আসলে 'স্মার্টলি পড়া' (Studzing Smarter) নিশ্চিত করে। যখন মস্তিষ্ককে তথ্য খুঁজে বের করার জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম করতে হয় (যা আবৃত্তি ধাপে নোট না দেখে তথ্য স্মরণ করার মতো), তখনই সেই স্মৃতির পথটি শক্তিশালী হয়। সহজলভ্য রিভিশন এই গভীর প্রচেষ্টার অভাব ঘটায়, তাই প্রচেষ্টার তীব্রতা স্মৃতির স্থায়িত্বের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। স্পেসড রেপিটিশন তথ্যের দীর্ঘস্থায়ী ধারণকে বহু গুণ। অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; "পড়ার সময় নোট রাখতে অয়, নোট না রাখলে পড়া কোনো কামে আইব না। ক্ষেত চাষবার সময় জমির আইল বাইন্ধ্যা রাখতে অয়।"

কার্যকরভাবে বই পড়া একটি উদ্দেশ্যমূলক কাজ, যা পাঠকের প্রচেষ্টা, পরিবেশ এবং জ্ঞানীয় কৌশলের ওপর নির্ভরশীল। এই প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে রয়েছে নিষ্ক্রিয়তা পরিহার করে সক্রিয়ভাবে জ্ঞানে যুক্ত হওয়া। ফ্রান্সিস পি. রবিনসনের SQ3R মডেল সক্রিয় পঠনের কাঠামো প্রদান করে, যেখানে সমীক্ষা এবং প্রশ্ন তৈরি করে পাঠক নিজেকে জ্ঞান আহরণের জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করে। অন্যদিকে, হারমান এবিনঘসের তত্ত্ব অনুসারে, দীর্ঘমেয়াদি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ব্যবধানযুক্ত পুনরাবৃত্তি এবং ফাইনম্যান কৌশলের মাধ্যমে পঠিত বিষয়কে সরলীকরণ করে অন্যকে শেখানোর মতো প্রচেষ্টা-নির্ভর কৌশলগুলো ব্যবহার করা আবশ্যক। সবচেয়ে কার্যকর পাঠক সেই ব্যক্তি, যিনি তার পঠনের উদ্দেশ্য (বিনোদনের জন্য ফিকশন নাকি জ্ঞান আহরণের জন্য নন-ফিকশন) অনুযায়ী কৌশল নির্বাচন করতে পারেন এবং নিয়মিতভাবে নিজের জ্ঞানকে পরীক্ষা ও পুনর্গঠন করতে পারেন। ফলস্বরূপ, বই পড়া কেবল একটি অভ্যাস নয়; বরং এটি একটি নিবিড় জ্ঞানীয় অনুশীলন, যা মস্তিষ্কের সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

যারা জ্ঞানী হতে চান, বড় লেখক হতে চান তাদের উদ্দেশ্যে অধ্যাপক আব্দুর রাজ্জাক সাহেব বলেছিলেন; "আরবী, ফার্সি ও সংস্কৃতি না জানলে ওরিজিন্যাল সোর্স ব্যাবহার করার ক্ষমতা কারও জন্মাবে না।" আমি জানি না জ্ঞানতাপস উর্দু ও ইংরেজি ভাষাকে কেনো বাদ দিলেন। যদি তিনি ভারত উপমহাদেশের প্রেক্ষাপটের ইতহাস ঐতিহ্য জানার জন্য মূল তিনটি ভাষার কথা বলেছেন। তবে বিশ্ব ইতহাস পাঠের মূলে প্রবেশ করতে হলে জ্ঞানতাপসের নির্দেশিত ভাষার সাথে সাথে ইংরেজি ও উর্দু ভাষার জ্ঞান থাকা আবশ্যক। বই হোক! জীবন পথের পাথেয়। ☒

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

ইতিহাস-ঐতিহ্য

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স : মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের পুনর্জাগরণের নায়ক

–নাঈম ইবনে উবায়দুল্লাহ★

পৃথিবী জুড়ে তখন মোঙ্গল ত্রাস। গোবির বুকে জাগা সেই মোঙ্গল ঝড়ে বিশ্ব যখন ইসলামী সভ্যতার প্রায় সমাপ্তিই দেখে ফেলেছিল, বিশাল-বিস্তৃত ও শক্তিশালী খাওয়ারিজম সাম্রাজ্য এবং ‘আব্বাসী খিলাফত যখন মোঙ্গল ঝড়ে ধ্বসে পড়েছিল, ঠিক তখনই আবির্ভাব হয় এমন এক মুসলিম বীরের যিনি অপরাজেয় মোঙ্গলদের রুখে দেন এবং ফের মুসলিম খিলাফতের এক নতুন ছাতা উপহার দেন। তিনি রুকনুদ্দিন বাইবার্স।

রুকনুদ্দিন বাইবার্স তার বীরত্বের জানান দেন ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দে সুলতান সাইফুদ্দিন কুতুজের নেতৃত্বে হওয়া ঐতিহাসিক ‘আইন জালুত’ যুদ্ধে কুতুজের সঙ্গী হয়ে। যে যুদ্ধে প্রথমবারের মতো মোঙ্গলদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয় মুসলিম বাহিনী। এই যুদ্ধে কুতুজ ও বাইবার্স একসাথে বীরত্বপূর্ণ লড়াই করেছিল। আইন জালুতে সুলতান কুতুজের বিজয় ছিল মুসলিমবিশ্বে বিশেষত মিসরের জন্য বিরাট এক ঘটনা। তাই বিজয়ী সুলতানকে অভ্যর্থনা জানাতে মিসরে চলছিল তুমুল প্রস্তুতি। কায়রোকে সুসজ্জিত করা হচ্ছিল। সুলতানের আগমনের অপেক্ষায় ছিল পুরো রাজ্যবাসী।

ঠিক সে সময়ই ঘটে যায় এক দুঃখজনক ঘটনা। আইন জালুতে বিজয় লাভের পর মিসরে যাওয়ার পথে নিজেদের মধ্যে কোনো এক দ্বন্দ্বের জোরে সুলতান কুতুজকে হত্যা করে ফেলেন বাইবার্স। আল্লাহ তা‘আলা তাকে ক্ষমা করুন। (হত্যা করার সঠিক কারণ জানা যায়নি সম্ভবত। একেক ঐতিহাসিক একেক তথ্য দিয়েছেন)।

কুতুজ হত্যার পরপরই বাইবার্স নিজেকে সুলতান ঘোষণা করেন। এরপর থেকেই শুরু হয় সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স উপাখ্যান। যা চলেছিল প্রায় দুই দশক সময় ধরে। তার ছিল ১৭ বছরের শাসনকাল। এই ১৭ বছরে ১৭টা মাসও নির্বিঘ্নে রাষ্ট্র চালাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ! বাকি জীবনের বেশিরভাগ সময়ই অশ্বপৃষ্ঠে ও যুদ্ধের ময়দানে কাটিয়েছেন। তিনি সর্বদাই যুদ্ধ করে বেড়িয়েছেন। ছুটতে হয়েছে শত্রুর পিছু পিছু। দেশ থেকে দেশান্তরে। চষে বেড়িয়েছেন পাহাড়, জঙ্গল, মরু-বিয়াবান আর সমুদ্র-উপকূলে।

বাইবার্স তিনটি দুর্ধর্ষ পরাশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। মোঙ্গল, ক্রুসেডার ও গুপ্তঘাতকদের দল হাশাশিন। যে হালাকু খানের মোঙ্গল বাহিনীকে কেউ হারাতে পারেনি, যে হালাকু খান তার বাহিনী নিয়ে সবকিছু লণ্ড-ভণ্ড করে দিতেন, যে হালাকু খান ‘আব্বাসী খিলাফতকে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়ে বাগদাদে রক্তবন্যা বইয়ে দিয়েছিলেন, সেই হালাকু খান ও তার মোঙ্গল বাহিনীকে বাইবার্স নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছেন। ক্রুসেডারদের কাছেও বাইবার্স ছিলেন এক ত্রাস ও আতঙ্কের নাম। যে হাশাশিনদের জন্য অনেক মুসলিম সুলতানই শান্তিতে থাকতে পারেননি, যে হাশাশিনরা মুসলিমদের অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে গুপ্ত হত্যা করেছে, যে হাশাশিনদের পরাজিত করা সম্ভব হয়নি, বাইবার্স তার দক্ষতা, সুনিপুণ সেনাবিন্যাস এবং অপূর্ব রণকৌশলে হাশাশিনদের রাজ্যের পতন ঘটান।

ঐতিহাসিক তথ্যমতে, ১৯ জুলাই, ১২২৩ খ্রিষ্টাব্দে রাশিয়ার উরাল ও ভল্গা নদীর মধ্যবর্তী ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে বৃহত্তর সারকোসিয়ায় অবস্থিত আধুনিক কাজাখস্তানের কিপচাক ভ্যালিতে জন্মগ্রহণ করা বাইবার্স মৃত্যু বরণ করেন ২৭ মুহাররম, ৬৭৬ হিজরি মোতাবেক পহেলা জুলাই, ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দে। প্রায় ৫৪ বছরের ছোট্ট এক জীবন। ৩৭ বছর বয়সে ১২৬০ খ্রিষ্টাব্দের ২৪ অক্টোবর মামলুক সিংহাসনে আরোহণ করেন সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্স। সেখান থেকে ১২৭৭ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছর রাষ্ট্র পরিচালনা করেন।

সুলতান রুকনুদ্দিন বাইবার্সের উল্লেখযোগ্য কিছু সামরিক কৃতিত্ব : দ্বিতীয় দফায় ‘আব্বাসি খিলাফতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন (যদিও সেটা মামুলক সাম্রাজ্য বলেই অভিহিত করেন ঐতিহাসিকগণ)। টানা চারটি ক্রুসেডের সফল মোকাবিলা করেন। প্রায় পুরো লেভান্ট অধিকার করে ভূমধ্যসাগরে মুসলিমবিশ্বের অবাধ প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করেন।

[পরবর্তী অংশ ৩৩ পৃষ্ঠায় দেখুন]

★ সরকারি এম.এম. কলেজ, যশোর। সাধারণ সম্পাদক, যশোর শহর শাখা শুব্বান। সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক, চণ্ডিপুর শাখা শুব্বান, মনিরামপুর, যশোর।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

পরামর্শ / সতর্কতা

শৈশবের ভারী ব্যাগ

–আব্দুল্লাহ আল নুমান★

আজও স্কুল থেকে ফিরেই যেন ক্লান্তিতে নুয়ে পড়ল ছোট্ট ফারাবি। তার আট বছরের ছোট্ট কাঁধে বইয়ের ব্যাগটা আজ আরো ভারি মনে হচ্ছিল। সন্ধ্যা নামতেই যখন অন্য শিশুরা খেলাধুলায় মেতে ওঠে, তখন ফারাবিকে তার কোচিং ক্লাসের জন্য প্রস্তুত হতে হয়। কোচিংয়ে যেতে যেতে সে ভাবছিল, তার বন্ধুদের মতো তারও যদি বিকেলে খেলার সুযোগ থাকত, তাহলে হয়তো ভালো লাগত। কিন্তু তার অভিভাবকের একটাই কথা, "আর একটু কষ্ট করে পড়ো, ভালো ফল করলেই তো সবকিছু পাবে।"

ফারাবির এই গল্প শুধু তার একার নয়, এটি আমাদের দেশের হাজার হাজার শিশুর জীবনের প্রতিদিনের চিত্র। যেখানে শৈশবের নির্মল আনন্দ, ধর্মীয় শিক্ষা, আদব-আখলাক, খেলাধুলা আর মানসিক বিকাশের চেয়ে পড়াশোনার চাপই হয়ে উঠেছে প্রধান। আমাদের শিশুদের শৈশব কি তবে এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতার নাম? শিশুদের প্রতি আমাদের করণীয় কী হওয়া উচিত, তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো–

১. প্রথমেই শিষ্টাচার শিক্ষা দেওয়া : শিশু যখন হাঁটতে শেখে তখন থেকেই তাকে সালাম দেওয়া, ধন্যবাদ বলা, বড়দের সম্মান করা, ছোটদের প্রতি দয়া প্রদর্শন শেখানো জরুরি। এ অভ্যাসগুলো তার অন্তরে দয়া, সহমর্মিতা ও পরস্পরের প্রতি সৌজন্য আচরণ গড়ে তুলবে।

ইসলামে শিষ্টাচার বা আদবকে ঈমানের অঙ্গ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। রাসূল (ﷺ) বলেন–

إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ.

"আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দিতে।"[১৩৬]

অন্য হাদীসে রাসূল (ﷺ) বলেন–

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا.

"ঈমানদারদের মধ্যে সবচেয়ে পূর্ণ সে-ই, যার চরিত্র সবচেয়ে উত্তম।"[১৩৭]

অতএব, শৈশব থেকেই শিশুদের মধ্যে শিষ্টাচার শিক্ষা না দিলে ভবিষ্যতে জ্ঞান থাকলেও চরিত্রহীন হয়ে পড়বে।

২. নম্রতা ও ভদ্রতার চর্চা করানো : শিশুদের ছোটবেলা থেকেই কোমল ভাষায় কথা বলা, ঝগড়া-বিবাদ এড়িয়ে চলা, অহংকার থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দিতে হবে। ভদ্রতা ও নম্রতা মানুষকে সমাজে গ্রহণযোগ্য ও ভালোবাসার যোগ্য করে তোলে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ﴾

"মু'মিনদের প্রতি তোমার ডানার ঝুঁকিয়ে দাও।"[১৩৮]

রাসূল (ﷺ) শিশুদেরও এ শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন–

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ.

"যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর জন্য নম্র হয়, আল্লাহ তা'আলা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করেন।"[১৩৯]

অতএব, নম্রতা শুধু সামাজিক সম্পর্কই উন্নত করে না; বরং মহান আল্লাহর নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

৩. ধর্মীয় জ্ঞান প্রদান : ছোট থেকেই মহান আল্লাহর পরিচয়, নামায, দু'আ, হালাল-হারামের মৌলিক শিক্ষা দেওয়া অপরিহার্য। এতে তাদের ঈমান দৃঢ় হবে, অন্তরে তাক্বওয়া জন্মাবে এবং তারা হারাম থেকে বিরত থাকার অভ্যাস করবে। রাসূল (ﷺ) বলেন–

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ.

"তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে সাত বছর বয়সে নামায পড়ার আদেশ দাও।"[১৪০]

ধর্মীয় জ্ঞান শিশুদের শুধু শিক্ষিতই করবে না; বরং প্রকৃত মু'মিন ও দায়িত্ববান মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে।

৪. মানবিক করে তোলা : শিশুদের শেখাতে হবে কিভাবে অভাবীদের সাহায্য করতে হয়, প্রাণীর প্রতি দয়া করতে হয়, সত্যবাদী হতে হয় এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿وَيُطْعِمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰى حُبِّهٖ مِسْكِيْنًا وَّيَتِيْمًا وَّأَسِيْرًا﴾

★শিক্ষার্থী- আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস সালাফিয়্যাহ, জোরবাড়ীয়া কোনাপাড়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

[১৩৬] আল-মুয়াত্তা মালিক- হা. ১৬১৪; আহমাদ- হা. ৮৯৫২।

[১৩৭] জামে' আত্ তিরমিযী- হা. ১১৬২; আবূ দাঊদ- হা. ৪৬৮২।

[১৩৮] সূরা আল-হিজর : ৮৮।

[১৩৯] সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৮৮।

[১৪০] সুনান আবূ দাঊদ- হা. ৪৯৫।

"তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য খাদ্য দেয় মিসকীনকে, ইয়াতীমকে এবং বন্দীকে।"[১৪১] রাসূল (ﷺ) বলেন–

الرَّاحِمُوْنَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمٰنُ.

"যারা দয়া প্রদর্শন করে, দয়াময় আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি দয়া করেন।"[১৪২]

মানবিক শিক্ষা তাদের হৃদয় কোমল করবে, সমাজে শান্তি ও ন্যায়ের পরিবেশ গড়বে।

৫. পারিবারিক শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়া : পরিবারই হলো শিশুর চরিত্র গঠনের প্রথম বিদ্যালয়। এখানে যদি ভিত্তি সঠিক হয় তবে ভবিষ্যতের শিক্ষা ও জীবন সঠিক পথে পরিচালিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا قُوْا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيْكُمْ نَارًا﴾

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের ও তোমাদের পরিবারকে আগুন থেকে রক্ষা করো।"[১৪৩]

এ আয়াত স্পষ্ট প্রমাণ করে, অভিভাবকের প্রথম দায়িত্ব হলো সন্তানকে দ্বীনী শিক্ষা ও সঠিক চরিত্র প্রদান।

৬. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার ধাপে ধাপে সূচনা : শিশুকে প্রথম থেকেই বইয়ের ভারী ব্যাগ দিয়ে চাপে ফেলা উচিত নয়; বরং ধাপে ধাপে বানান শেখানো, গল্প শোনানো, সুন্দর লেখা শেখানো ও মৌলিক পাঠে অভ্যস্ত করানো ধর্মীয় আদব আখলাক পারিবারিকভাবে শিক্ষা দেওয়া উচিত। পরিবার যেন শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এটাই কাম্য। অতঃপর ধাপে ধাপে উপযোক্ত প্রতিষ্ঠান দেখে শিশুর সুশিক্ষা নিশ্চিত করা, অভিবাবক হিসেবে আমাদের একান্ত দায়িত্ব। রাসূল (ﷺ) বলেন–

عَنْ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنه) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (ﷺ) يَقُوْلُ : كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِيْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِيْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِيْ مَالِ أَبِيْهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, "তোমাদের প্রত্যেকেই একজন দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। ইমাম (শাসক) তার প্রজাদের জন্য দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। পুরুষ তার পরিবারের জন্য দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। নারী তার স্বামীর গৃহ ও সন্তানদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। কোনো কর্মচারী তার মালিকের সম্পদের ব্যাপারে দায়িত্বশীল এবং সে তার ব্যাপারে জবাবদিহি করবে। অতএব তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল এবং প্রত্যেকেই তার দায়িত্বের ব্যাপারে জবাবদিহি করবে।"[১৪৪]

এই হাদীসটি মানবজীবনের প্রতিটি স্তরে দায়িত্ববোধ ও জবাবদিহিতার শিক্ষা দেয়।

ইসলাম শুধু শাসক বা নেতা নয়; বরং প্রতিটি মানুষকেই তার অবস্থান অনুযায়ী দায়িত্বশীল মনে করে।

পিতা সন্তানের জন্য, শিক্ষক ছাত্রের জন্য, স্ত্রী স্বামীর গৃহের জন্য, কর্মচারী কাজের ক্ষেত্রে– সবাই কোনো না কোনোভাবে জবাবদিহির আওতায়।

তাই মুসলিম হিসেবে সন্তানের প্রতি দায়িত্বশীল আচরণ করা ঈমানের দাবি। রাসূল (ﷺ) অপর হাদীসে বলেন : إِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ. "নিশ্চয়ই এই দ্বীন সহজ।"[১৪৫]

অতএব, শিক্ষা এমন হওয়া উচিত যা সহজ, আনন্দময় এবং শিশুদের স্বাভাবিক বিকাশের সহায়ক হয়।

৭. শুধু ভালো ফল নয়, মানুষ তৈরি করাই লক্ষ্য হওয়া উচিত : আজকের সমাজে আমরা শিশুদের শুধু ভালো রেজাল্ট করতে শেখাই, কিন্তু নৈতিকতা শেখাতে ব্যর্থ হই। অথচ ইসলামের দৃষ্টিতে প্রকৃত মানুষ সেই, যার মধ্যে তাক্বওয়া, নৈতিকতা, শিষ্টাচার ও মানবিকতা বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক সম্মানিত সে-ই, যে সর্বাধিক তাক্বওয়াবান।"[১৪৬]

রাসূল (ﷺ) বলেন–

إِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

---

[১৪১] *সূরা আদ-দাহর : ৮।*
[১৪২] *জামে' আত্-তিরমিযী- হা. ১৯২৪।*
[১৪৩] *সূরা আত্-তাহ্রীম : ৬।*
[১৪৪] *সহীহুল বুখারী- হা. ৮৯৩; সহীহ মুসলিম- হা. ১৮২৯।*
[১৪৫] *সহীহুল বুখারী- হা. ৩৯।*
[১৪৬] *সূরা আল-হুজুরা-ত : ১৩।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

"আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চেহারা ও ধন-সম্পদের দিকে তাকান না; বরং তিনি তোমাদের অন্তর ও 'আমলের দিকে তাকান।"[১৪৭] তাই লক্ষ্য হওয়া উচিত শিশুদের মধ্যে মানুষ গড়ার মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করা।

এভাবে ইসলামিক ভাবধারায় শিশুকে শিক্ষা ও চরিত্র গঠন করলে তারা শুধু শিক্ষিত নয়; বরং প্রকৃত মু'মিন হবে, নৈতিকভাবে সুদৃঢ়, ভদ্র ও মানবিক মানুষ। কিন্তু আমরা শিশুদের ছোটকাল থেকেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার প্রতি এতটাই গুরুত্ব দেই যে, তাদের কোমল কাঁধে ভারী স্কুলব্যাগের বোঝা চাপিয়ে দেই। প্রতিদিন ক্লাসে প্রতিযোগিতার দৌড়ে নামিয়ে দিই, যেন শৈশব মানেই শুধু নম্বরের লড়াই। এই অযথা প্রতিযোগিতা ও চাপ তাদের স্বাভাবিক আনন্দ, খেলা-ধুলা ও মানসিক বিকাশকে বাধাগ্রস্ত করে। ফলে শিশুরা পড়াশোনাকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম হিসেবে না দেখে, একে কেবল বোঝা হিসেবে অনুভব করতে শুরু করে। এর মাধ্যমে শিশুরা যে সমস্ত ক্ষতির সম্মুখীন হয় তা ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হলো–

১. মানসিক ও শারীরিক চাপ : শিশুদের ওপর অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপ তাদের মানসিক অবসাদ, হতাশা এবং উদ্বেগের কারণ হয়। খেলাধুলা বা পর্যাপ্ত ঘুমের অভাবে তাদের শারীরিক বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয় এবং নানা রকম স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।

২. সৃজনশীলতা ও কৌতূহল হ্রাস : শুধু মুখস্থ বিদ্যা এবং পরীক্ষার ফলাফলের ওপর জোর দেওয়ার কারণে শিশুদের মধ্যে নতুন কিছু শেখার আগ্রহ কমে যায়। তাদের সৃজনশীলতা এবং নিজস্ব চিন্তাভাবনার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

৩. সামাজিক দক্ষতার অভাব : অতিরিক্ত পড়াশোনার চাপে শিশুরা বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটাতে পারে না। এর ফলে তাদের মধ্যে সামাজিক সম্পর্ক তৈরি করার এবং দলগতভাবে কাজ করার দক্ষতা কমে যায়, যা ভবিষ্যতের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪. নিদ্রাহীনতা এবং মেজাজ খিটখিটে হওয়া : দীর্ঘ সময় ধরে পড়াশোনা করার কারণে অনেক শিশু পর্যাপ্ত ঘুম পায় না। ঘুমের অভাবে তাদের মেজাজ খিটখিটে হয় এবং পড়াশোনার প্রতি মনোযোগও কমে যায়।

৫. অতিরিক্ত চাপের কারণে পড়াশোনাকে বোঝা মনে করা : শিশুরা সারাদিন পড়াশোনার অতিরিক্ত চাপের মুখে থেকে যখন সামান্য অবসর পায়, তখন তারা যেন লাগামহীন দুষ্টামিতে মেতে ওঠে। কারণ, সারাক্ষণ চাপের মধ্যে থাকার ফলে পড়াশোনা তাদের কাছে আনন্দ নয়; বরং এক বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। এতে তারা নিজ ইচ্ছায় খুব কম পড়তে চায়, পড়াশোনা মানে যেন শাস্তি বা বাধ্যবাধকতা। অথচ পড়াশোনা হওয়া উচিত আনন্দের বিষয়, জ্ঞান অন্বেষণের এক স্বতঃস্ফূর্ত যাত্রা। তাই শিশুদের উপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি না করে, তাদের জন্য পড়াশোনাকে আনন্দময় ও স্বতঃস্ফূর্ত করে তোলা আমাদের দায়িত্ব।

উপসংহার : সন্তান আমাদের অমূল্য আমানত। যদি আমরা তাদের শৈশবকে জ্ঞান ও চরিত্রের সঠিক আলোকে গড়ে তুলতে পারি, তবে তারাই হবে আগামী দিনের সৎ, নৈতিক ও মানবিক নেতৃত্ব। আর যদি আমরা তাদের কেবল ভারী ব্যাগ ও নম্বরের প্রতিযোগিতায় বন্দি করি, তবে আমরা আসলে তাদের স্বপ্ন, আনন্দ ও ভবিষ্যৎ দু'টোই ধ্বংস করব। ☒

[১৪৭] *সহীহ মুসলিম- হা. ২৫৬৪।*

কবিতা

সত্যমুখী পিপাসা

আব্দুল্লাহ বিন বেলাল হোসাইন★

সত্যের পিপাসা, এক অন্তহীন নদী,
প্রতিটি ঢেউয়ে হারায় এক নতুন চিত্র।
যতই ছুটে চলি, ততই গভীরতা বাড়ে,
এই পথের শেষে কি তবে কিছু নেই, কিছু নয়?

চাঁদের আলো, মেঘের ঘন ছায়া,
অন্তর নিঃশব্দে কাঁদে, শোনে না পৃথিবী।
সত্যের পথের বুকে, নিঃশব্দ এক সুর,
বৃষ্টির মতো ভিজে যায়, আমার পিপাসার দুঃখ।

বাতাসে মিলায় সত্যের প্রতিধ্বনি,
তবু হৃদয়ের মাঝে, এক বিরাট শূন্যতা।
হাজার ভাষায়, হাজার রূপে,
এই পিপাসা শুধুই সত্যের খোঁজে।

শেষে যখন পৌঁছব, জানি না কোথায়,
সত্যের জলটুকু, কি তাহলে আমার হবে?
শুধু জানি, যতই খুঁজে চলি,
পিপাসা কখনো মেটে না, কখনো থামে না।

★ *মাদ্রাসা দারুল হাদীস সালাফিয়্যাহ, পাঁচরুখী, আড়াই হাজার, নারায়ণগঞ্জ।*

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

কবিতা

অভিনয়

শেখ শান্ত বিন আব্দুর রাজ্জাক*

আমি তো সুখি নই কেমনে কবো বুঝিয়ে
সব যন্ত্রণা ঢেকেছি মিষ্টি হাসি দিয়ে;
কেহ্ তো জানেনা, শুধু জানে মোর বিধাতা
কেহ্ তো দেখে না, দেখে নিশির নীরবতা।
সবাই দেখি সমুদ্র মনের উল্লাসে নিত্য করে
তাই কল্লোল রুপে, হেলিয়ে দুলিয়ে আসে তীরে;
সকলে ছুটে যাই দেখতে, সঙ্গে নিয়ে প্রিয়জন
ঐ তরঙ্গ কষ্ট কম্পনের দীর্ঘ শ্বাস, ভেবেছ কি কোনো জন?
আমি সেই বেদন পূর্ণ সাগর
শরীর মর্তের চিত্ত পাথর;
সুখের লেশ তো আমাতে নেই
হৃদয়ে সপ্ত অভ্রসম ব্যথা,
অন্যকে কভু বুঝতে না-দেই
আমি তো এক মিথ্যুক অভিনেতা।
সবাই আপন কষ্ট করে ব্যক্ত
প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পন্থায়;
আমিও করি ব্যক্ত কত বেদন সিক্ত
একাকি নিঝুম নিশীথ নিরালায়।
হাবিয়া নরকের অনলে পুড়ে, হয়েছি এক ভিন্ন কয়লা
শোভন পরিচ্ছদে আবৃত হৃদয়ের ক্ষত, ময়লা-
আমার বেদনে কেহ্ ব্যথিত হোক আমি কভু না-চাই
অজস্র শোক হৃদয়ে লুকিয়ে, অন্যকে হাসাতে মজা পাই।
হয়ে বড় দুঃখি করি সুখি জনের অভিনয়
সকলে হয় খুশি জানে না আসল পরিচয়;
তবু খুঁজে পায় আমার মাঝেই সততা
আমি খাঁটি মিথ্যুক এক অভিনেতা।
বাদলপূর্ণ নীরদে আষাঢ়ের অবিরাম ঝড়ে আঁখি
বুকে আমার খরা চৈত্রের তৃষ্ণার্ত চাতক পাখি;
ক্ষত-বিক্ষত এ শ্রীগাত্র লোকচক্ষুর অগোচরে
আমি পত্রহীন শুষ্কপর্ণী গহীন কুঞ্জের অভ্যন্তরে।
এ কষ্ট মালঞ্চের সংগী হতে কেউ আসেনি, তুমি এলে কেন?
এ বুকে বয়ে চলে প্রশান্ত সাগরের কল্লোল যেন-
চলেই যখন এসেছ, কেমনে বারণ করি!
থাকো, আমার পাশে হয়ে ভাঙা তরি।
বাইরে দেখে চিরসুখী ভেবে, করেছ তুমি ভুল
আমি বসন্তের গন্ধহীন কৃষ্ণচূড়া ফুল;
কান পেতে শুনে নাও, আমার পরিচয়
সুখহীন করি আমি সুখির অভিনয়।

---

* বামনাছড়া, উলিপুর, কুড়িগ্রাম।

আমাদের মাদ্‌রাসা

আব্দুল্লাহ আল নূমান*

সবুজে ঘেরা মনোরম পরিবেশ,
ফসলে ভরা মাঠে মিষ্টি আবেশ।
জোড়বাড়ীয়া কোনাপাড়ায় দীপ্ত সে ঠিকানা,
মাদ্‌রাসা আমাদের গৌরব, সবার সেটা জানা।

নিঝুম নীরব শান্ত পরিবেশ, নেই কোলাহল ধ্বনি,
পাখির কূজন, বাতাসে ভেসে প্রশান্তির বাণী।
জ্ঞান-তরীতে ভাসায় সবাই, জাগায় আশা আলো,
মহান আল্লাহর পথে গড়ে তোলা স্বপ্নের মহাকালো।

খেলাধুলার বিশাল প্রান্তর, আনন্দ ভরে যায়,
হাসিমুখে ছাত্ররা খেলে, প্রাণের মেলা ছায়।
দৌড়ে বেড়ায়, খেলায় মাতে, মনটা হয় খুশি,
স্বাস্থ্য-চঞ্চলতায় ভরা জীবন হয় সুখী।

শিক্ষার মান যে সবার সেরা, গর্ব ভরে বলে,
ময়মনসিংহে শীর্ষ মাদ্‌রাসা, আলোর প্রদীপ জ্বলে।
দক্ষ শিক্ষকগণ নিরলস পরিশ্রম করে যান,
প্রতিটি ছাত্রের অন্তরে জ্ঞানের শিখা টান।

আমাদের প্রধান শিক্ষক দয়ালু, বিচক্ষণ,
তাঁর স্নেহে পথ চলা হয় উজ্জ্বল, সুশিক্ষণ।
তাঁর নীতির ছায়ায় থাকে শৃঙ্খলার ধারা,
সবার কাছে তিনি স্নেহের মহাকাব্যের ধ্বরা।

সাংস্কৃতিক অঙ্গনে ছাত্ররা জিতেছে বহুবার,
প্রতিভা দিয়ে করেছে জয়, পেয়েছে সবার পার।
আবৃত্তি, গজল কিরাতে মেলে সৃষ্টির সোনালি ছাপ,
প্রতিটি সাফল্যে উজ্জ্বল হয় আমাদের প্রতিভার দীর্ঘ ধাপ।

এই মাদ্‌রাসা শুধু শিক্ষা নয়, চরিত্র গড়ে তোলে,
নীতির আলোয় জীবন সাজায়, কল্যাণে মন মেলে।
প্রতিটি ছাত্র ভালোবাসে আপন ঘরের মতো,
এই মাদ্‌রাসাই স্বপ্নভূমি, কেউ হয় না আশাহত।

জ্ঞান ও তাক্বওয়ার পথে যারা চলতে চায়,
তাদের প্রাণে মাদ্‌রাসারই অনন্ত ভালোবাসা জাগায়।
এ মাদ্‌রাসা আমাদের গর্ব, চির অম্লান স্মৃতি,
আল্লাহর পথে দিক সে আলো, থাকুক যুগে যুগে অখণ্ড অগ্রগতি।

বি. দ্র. এই কবিতায় সালাফি মানহাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠান আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ আস-সালাফিয়্যাহ'র মনোরম পরিবেশ, পাঠদানের মান এবং মাদ্‌রাসার প্রাপ্তিগুলোকে হৃদয়ের আবেগে লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

---

* আল জামিয়াতুল ইসলামিয়্যাহ্ আস সালফিয়্যাহ্, জোরবাড়ীয়া, কোনাপাড়া, ফুরবাড়ীয়া, ময়মনসিংহ্।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

শুব্বান সংবাদ

কালীন নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা

গত ২৪ অক্টোবর রোজ শুক্রবার বাদ মাগরিব, নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীস-এর অন্তর্গত কালীন নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়ত ও শুব্বানের উদ্যোগে ১১ তম মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। টেকদাসেরদিয়া উত্তর পাড়া জামে মসজিদ রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ। এতে পবিত্র কুরআন থেকে তিলাওয়াত করেন হাফেয নাফিজ, সভাপতিত্ব করেন কালনী নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সভাপতি শাইখ অধ্যাপক আরমানুদ্দিন। আলোচনা করেন কেন্দ্রীয় শুব্বান এর সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ রমজান মিয়া, নারায়ণগঞ্জ জেলা শুব্বানের সাহিত্য সংস্কৃতির সম্পাদক, শাইখ আনিসুর রহমান, দাউদপুর ইউনিয়ন শুব্বানের সভাপতি শাইখ ইমরান হোসেন, কালীন নোয়াগাঁও এলাকা জমঈয়তের সাংগঠনিক সম্পাদক শাইখ হাফেজ মামুনুর রশীদ।

দাউদপুর ইউনিয়ন শুব্বানের মাসিক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

অদ্য ৩০ অক্টোবর ২০২৫ ইং বৃহস্পতিবার, বাদ মাগরিব হতে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ, দাউদপুর ইউনিয়ন-এর উদ্যোগে উত্তর হাটাব বড় বাড়ি জামে মসজিদ, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জে "মাসিক তাবলীগী আলোচনা সভা" আয়োজন করা হয়। এতে পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করেন দাউদপুর ইউনিয়ন শুব্বানের প্রচার সম্পাদক আব্দুল্লাহ নিরব। সভাপতিত্ব করেন দাউদপুর ইউনিয়ন শুব্বানের সভাপতি শাইখ ইমরান হোসেন।

উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলা জমঈয়তের তা'লীম ও তারবিয়্যাহ্ বিষয়ক সম্পাদক শাইখ উপাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম রাজ (হাফিযাহুল্লাহ)। প্রধান আলোচক হিসাবে আলোচনা পেশ করেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক ও নারায়ণগঞ্জ জেলার সেক্রেটারি জেনারেল শাইখ মোঃ রমজান মিয়া (হাফিযাহুল্লাহ)। আরো আলোচনা করেন বিশেষ আলোচক হিসাবে জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর দাউদপুর ইউনিয়ন শাখার সহ-সভাপতি শাইখ রিদোওয়ান বিন নূরুল হুদা, সাংগঠনিক সম্পাদক, শাইখ আব্দুল্লাহ আল মামুন, মক্কা হজ্জ গ্রুপের পরিচালক শাইখ রবিউল ইসলাম প্রমুখ।

ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বানের কাউন্সিল অনুষ্ঠিত

গত ০৮ নভেম্বর ২০২৫ শনিবার দুপুর ২টায় ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে ঠাকুরগাঁও জেলা শুব্বানের ৭ম জেলা কাউন্সিল অধিবেশন জেলা সভাপতি মুহা. মাসউদ রেজার সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহা. জুয়েল রানার সঞ্চালনায় পবিত্র কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জমঈয়ত শুব্বানে আহলে হাদীস বাংলাদেশ-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. আব্দুল্লাহিল হাদী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঠাকুরগাঁও জেলা জমঈয়তে আহলে হাদীসের সম্মানিত সভাপতি শাইখ মঞ্জুরে খোদা এবং সহকারী সেক্রেটারি মুহা. দেলাওয়ার হোসেন।

প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জমঈয়তে আহলে হাদীস, ঠাকুরগাঁও জেলা শাখার সেক্রেটারি শাইখ আসাদুল্লাহ খাঁন গালিব মাদানী।

এছাড়াও জেলা জমঈয়ত ও শুব্বানের নেতৃবৃন্দ এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ উপস্থিত থেকে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য ও নবগঠিত কমিটির নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সভাপতি মো. আব্দুল্লাহীল হাদী। এতে সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হন মুহা. মাসউদ রেজা এবং সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নির্বাচিত হন মুহা. জুয়েল রানা। পূর্ণাঙ্গ তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো–

মুহা. মাসউদ রেজা (সভাপতি), আতিকুল ইসলাম (সহ-সভাপতি), মুহা. শামিম আলম (সহ-সভাপতি), মুহা. জুয়েল রানা (সাধারণ সম্পাদক), আব্দুল আওয়াল (যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক), আবু রায়হান রকি (কোষাধ্যক্ষ), মুজাহিদ কবীর (সাংগঠনিক সম্পাদক), গোলাম রব্বানী (প্রচার সম্পাদক), আব্দুল হালীম (যুগ্ম-প্রচার সম্পাদক), ইমরান আলী (সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক), তানভীর হোসেন রাফী (ছাত্র/ সমাজ কল্যাণ সম্পাদক), মুহা. নুর উদ্দীন (প্রশিক্ষণ সম্পাদক), আলী আরমান মীস (তথ্য ও গবেষণা সম্পাদক), মুহা. ইয়াকুব আলী (দফতর সম্পাদক), মাসূম মোল্লা (পাঠাগার সম্পাদক), মাসুদ রানা (যুগ্ম পাঠাগার সম্পাদক)। **সদস্য :** মো. মুক্তার হোসেন, আবু বকর, নয়ন আলী।

পরিশেষে সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও দু'আর মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি হয়।

৬৭ বর্ষ ॥ ০৫-০৬ সংখ্যা ❖ ১০ নভেম্বর- ২০২৫ ঈ. ❖ ১৮ জমাদিউল আউয়াল- ১৪৪৭ হি.

স্বাস্থ্য-সচেতনতা

শীতের সূচনা : সকল বয়সীদের সচেতনতা জরুরি

–আরাফাত ডেস্ক

বাংলাদেশে নভেম্বরের মাঝামাঝি থেকেই ধীরে ধীরে শীতের আগমন ঘটে। সকালের শিশির, নরম কুয়াশা আর হালকা ঠাণ্ডা হাওয়া জানান দেয় মৌসুম বদলের। প্রকৃতির এই রূপ অনেকের কাছে আনন্দের হলেও স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, শীতের সূচনা মানেই শরীরের বাড়তি যত্ন নেওয়া। কারণ, আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরের প্রতিরোধক্ষমতা কমে যায়, যা নানা রোগব্যাধির ঝুঁকি বাড়ায়।

শীতকাল ও স্বাস্থ্যঝুঁকি : এক বাস্তব চিত্র

শীতকালে তাপমাত্রা হ্রাস পাওয়ার কারণে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ, সর্দি-কাশি, নিউমোনিয়া, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাঁপানি এবং ত্বকজনিত রোগ বৃদ্ধি পায়। শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য এই সময়টি বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, প্রতি বছর শীত মৌসুমে দেশে গড়পড়তা ১৫ থেকে ২০ শতাংশ মানুষ ঠাণ্ডাজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। বিশেষ করে ডিসেম্বর ও জানুয়ারিতে শিশু হাসপাতালে ভর্তি রোগীদের এক-তৃতীয়াংশই শ্বাসকষ্ট ও নিউমোনিয়ায় ভোগে।

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ বলেন, "শীতের শুরুতেই প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। অনেকেই ভাবেন ঠাণ্ডা লাগা তুচ্ছ বিষয়, কিন্তু এটি নিউমোনিয়া, ব্রঙ্কাইটিস এমনকি হৃদরোগের কারণও হতে পারে। শিশু, গর্ভবতী নারী ও বয়স্কদের সবচেয়ে বেশি সতর্ক থাকা উচিত।"

খাদ্যাভ্যাসে সচেতনতা : রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার চাবিকাঠি

শরীর গরম রাখার জন্য ও রোগ প্রতিরোধে পুষ্টিকর খাদ্যের বিকল্প নেই।

☑ প্রতিদিন পর্যাপ্ত শাকসবজি, ফলমূল, ডিম, মাছ ও দুধ খাওয়া উচিত।

☑ মৌসুমি ফল যেমন পেয়ারা, কমলা, আপেল, মাল্টা –এগুলো ভিটামিন 'সি'-সমৃদ্ধ, যা শরীরের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়।

☑ রসুন, আদা ও কালোজিরা শীতে সংক্রমণ প্রতিরোধে উপকারী প্রাকৃতিক উপাদান হিসেবে কাজ করে।

পুষ্টিবিদদের পরামর্শ হলো– "শীতের সময় অনেকেই পানি কম পান করেন, যা শরীরে পানিশূন্যতা তৈরি করে। দিনে অন্তত আট গ্লাস পানি পান করা এবং গরম তরল খাবার যেমন স্যুপ, হারবাল চা গ্রহণ করা অত্যন্ত উপকারী।"

শিশু ও বয়স্কদের বিশেষ যত্ন

শিশুদের শরীর ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে কম, তাই তাদের জন্য পর্যাপ্ত উষ্ণ পোশাক অপরিহার্য।

☑ সকালে ও রাতে টুপি, মোজা ও গরম জামা পরাতে হবে।

☑ কুয়াশায় বাইরে যাওয়া এড়িয়ে চলা উচিত।

বয়স্কদের ক্ষেত্রে শীত রক্তচাপ ও হৃদযন্ত্রের সমস্যা বাড়ায়। হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের মতে, "শীতকালে তাপমাত্রা কমে গেলে শরীরের রক্তনালী সংকুচিত হয়, এতে রক্তচাপ হঠাৎ বেড়ে যেতে পারে। তাই সকালে ব্যায়ামের আগে হালকা গরম পানীয় পান করে শরীর উষ্ণ করা জরুরি।"

ত্বক ও শ্বাসযন্ত্রের যত্ন

শীতকালে বাতাস শুষ্ক হয়ে যায়, ফলে ত্বক ও ঠোঁট ফেটে যায়।

চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. লুবনা হক বলেন, "গরম পানিতে নয়, কুসুম গরম পানিতে গোসল করা উচিত। গোসলের পরপরই ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। নারকেল তেল বা ভ্যাসলিন প্রাকৃতিক উপায়ে ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখে।"

এছাড়া ধুলাবালি ও কুয়াশায় মুখে মাস্ক ব্যবহার করলে শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণ অনেকাংশে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

সুস্থ থাকার সহজ উপায়

১. নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন এবং সকালে সূর্যের আলোয় ২০-৩০ মিনিট থাকুন।

২. পর্যাপ্ত পানি পান করুন, এমনকি তৃষ্ণা না পেলেও।

৩. সিগারেট ও ধুলাবালি এড়িয়ে চলুন, কারণ এগুলো হাঁপানির ঝুঁকি বাড়ায়।

৪. সর্দি-কাশি বা জ্বর দীর্ঘস্থায়ী হলে নিজে ওষুধ না খেয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

৫. রাতে ঘুমানোর সময় জানালা বন্ধ রেখে উষ্ণ বিছানায় শোয়ার ও ঘুমানোর ব্যবস্থা করুন।

উপসংহার : সচেতনতাই সুরক্ষার প্রথম ধাপ

শীতের সৌন্দর্য উপভোগের পাশাপাশি নিজের স্বাস্থ্য সচেতনতাকেও সমান গুরুত্ব দিতে হবে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা মনে করেন– শরীরের যত্ন, সঠিক খাদ্যাভ্যাস ও সময়মতো চিকিৎসা গ্রহণ করলে শীতকালও হতে পারে সুস্থতা ও প্রাণচাঞ্চল্যের মৌসুম। শীত উপভোগ করুন, তবে ভুলবেন না–

"সতর্কতাই সর্বোত্তম প্রতিরোধ।"

সূচীপত্র

প্রচ্ছদ রচনা

চেরামান জুমা মসজিদ : মহানবী (ﷺ)-এর যুগে নির্মিত ভারতের প্রথম মসজিদ

–আবু ফাইয়ায

চিরসবুজ প্রকৃতির রাজ্য কেরালা–প্রাচীন ভারতবর্ষের এক বন্দরনগর, যেখানে সুগন্ধি মসলার সুবাসে মিশে আছে হাজার বছরের ইতিহাস। এখানকার কোদুঙ্গাল্লুর জেলায় অবস্থিত চেরামান জুমা মসজিদকে ঘিরে এমন এক কাহিনি প্রচলিত, যা ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামের সূচনা কাহিনি বললেও ভুল হবে না।

স্বপ্নে দেখা অলৌকিক দৃশ্য : ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে কেরালার চেরা রাজ্যের রাজা ছিলেন চেরামান পেরুমাল রামা ভার্মা কুলাশেখারা। এক রাতে তিনি স্বপ্নে দেখেন, আকাশে পূর্ণচাঁদ হঠাৎ দু'টি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গেল! ঘুম ভাঙার পরও তিনি ভাবনায় পড়লেন –এ কেমন স্বপ্ন? রাজ্যের জ্যোতিষী ও পুরোহিতেরা কেউই এর সঠিক ব্যাখ্যা দিতে পারল না।

ঠিক সেই সময়ে মুজিরিস বন্দরে (বর্তমান কোদুঙ্গাল্লুরের নিকটবর্তী অঞ্চল) নোঙর করে আরবের এক বাণিজ্যিক জাহাজ। জাহাজে ছিলেন শেখ সাহিরুদ্দিন বিন বাকিউদ্দিন আল মাদানি ও তাঁর সহযাত্রীরা। রাজা তাঁদের প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানান এবং নিজের অদ্ভুত স্বপ্নের কথা বলেন। আরব বণিকেরা বিস্মিত হয়ে জানান, এই ঘটনার সঙ্গে ইসলামের নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর এক অলৌকিক মু'জিযাহ্ জড়িত –নবী (ﷺ) চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে আবার একত্রিত হওয়ার আদেশ দিয়েছিলেন।

রাজা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি বুঝতে পারেন, স্বপ্নে দেখা সেই দৃশ্য নিছক কল্পনা নয়; বরং এক ঐশ্বরিক ইঙ্গিত।

রাজার ইসলাম গ্রহণ ও নবীজি (ﷺ)-এর সাথে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ : ইসলাম সম্পর্কে জানার আগ্রহে রাজা তাঁর রাজ্যকে তিন ভাগে ভাগ করে দেন –প্রতিটি ভাগ শাসনের দায়িত্ব দেন তাঁর পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রদের হাতে। তারপর নিজে যাত্রা করেন আরবের পথে, নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সাক্ষাৎ পাবার আশায়।

ইতিহাসবিদ এম. হামিদুল্লাহ'র 'মোহাম্মদ রাসূলুল্লাহ', উইলিয়াম লোগানের 'মালাবার ম্যানুয়াল' এবং আহমেদ জইনুদ্দিন মাখদুমের 'তুহফাতুল মুজাহিদিন'-এ বর্ণিত আছে, রাজা চেরামান পেরুমাল আরবে গিয়ে নবী মুহাম্মদ (ﷺ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং "তাজউদ্দিন" নাম গ্রহণ করেন। নবী (ﷺ)-এর হাতে তিনি একটি উপহার দেন– ভারতীয় আদার আচার। হাদীসে উল্লেখ আছে, নবী (ﷺ) সেই আচার সাহাবিদের মাঝে ভাগ করে দেন।

ফেরার পথে রাজা গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং বর্তমান ওমানের সালালাহ অঞ্চলে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর আগে তিনি তাঁর পুত্রদের উদ্দেশে এক চিঠি লিখে যান, যাতে ইসলামের দূতদের যথাযথ সম্মান ও সহায়তা দেওয়ার নির্দেশ দেন।

ভারতের প্রথম মসজিদের নির্মাণ : রাজা চেরামানের মৃত্যুর পর নবীর সাহাবি মালিক বিন দিনার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ও তাঁর সহযাত্রীগণ সেই চিঠি নিয়ে কেরালায় ফিরে আসেন। স্থানীয় শাসক তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান এবং ইসলাম প্রচারের অনুমতি দেন।

তাঁদের উদ্যোগেই ৬২৯ খ্রিষ্টাব্দে নির্মিত হয় চেরামান জুমা মসজিদ –যা আজও ভারতের প্রথম এবং উপমহাদেশের প্রাচীনতম সক্রিয় মসজিদ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে।

এই মসজিদের স্থাপত্যে রয়েছে কেরালার ঐতিহ্যবাহী কাঠের ছাদ ও স্থানীয় কারুকাজের ছোঁয়া, যা হিন্দু মন্দির স্থাপত্যের সঙ্গে এক নান্দনিক সংমিশ্রণ সৃষ্টি করেছে। এতে প্রতিফলিত হয়েছে কেরালার ধর্মীয় সহাবস্থান ও সহিষ্ণুতার চিরন্তন সংস্কৃতি।

ঐতিহ্য ও সংরক্ষণ : আজও চেরামান জুমা মসজিদ কেরালার গৌরবময় ঐতিহ্যের প্রতীক। রাজ্য সরকার "মুজিরিস হেরিটেজ প্রজেক্ট"-এর আওতায় এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটির সংস্কার ও সংরক্ষণের কাজ করছে।

কেরালার পর্যটনমন্ত্রী পি. এ. মোহাম্মদ রিয়াজ বলেন, "কেরালা সব সময় অতিথিদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে প্রস্তুত। সেখানকার সংস্কৃতি জাতপাত, ধর্ম বা বর্ণের ঊর্ধ্বে– চেরামান জুমা মসজিদ তার জীবন্ত প্রমাণ।"

ইতিহাসের বার্তা : চেরামান জুমা মসজিদ কেবল একটি 'ইবাদতগাহ নয়, এটি ভারতের ইতিহাসে সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও বাণিজ্যের মিলনস্থল। এখানেই প্রথমবারের মতো আরবের বণিকেরা, দক্ষিণ ভারতের রাজারা এবং ইসলামের বার্তা মিলেমিশে এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল।

সাড়ে তেরোশ বছরের পুরোনো এই মসজিদ, আজও তা সাক্ষ্য দেয়। ☒

সূচীপত্র

THE WEEKLY ARAFAT, REG. DA.60 ■ PRICE Tk. 25.00

الجامعة الإسلامية العالمية للعلوم والتقنية ببنغلاديش

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামী ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি বাংলাদেশ

IIUSTB

মেধাবৃত্তির সুবিধা

ভর্তি চলছে

Fall Semester 2025

সরকার এবং ইউজিসি অনুমোদিত

৫০% টিউশন ফি ছাড়

ব্যাচেলর'স প্রোগ্রামস

- B.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- B.Sc. in Computer Science and Engineering (CSE)
- B.Sc. in Electrical and Electronic Engineering (EEE)
- Bachelor of Business Administration (BBA)

মাস্টার্স প্রোগ্রামস

- M.A. in Al Quran and Islamic Studies (AQIS)
- Master of Business Administration (MBA)
  Master of Business Administration (MBA-Regular)
  Master of Business Administration (MBA-Executive)

বিশেষ বৈশিষ্ট্যসমূহ

- মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে নিজস্ব ৯ একর জমির উপর স্থায়ী গ্রীন ক্যাম্পাস
- উচ্চতর গবেষণা এবং কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা
- আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা
- দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা শিক্ষকমণ্ডলী
- ডেডিকেটেড ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেটসহ উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কম্পিউটার ল্যাব
- আধুনিক মেশিনারিজ ও যন্ত্রপাতি সজ্জিত ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব
- শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস
- 'সাইলেন্ট স্টাডি' এবং 'গ্রুপ স্টাডি' সুবিধাসহ বিশাল লাইব্রেরি
- ২৪x৭ সিসিটিভি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা প্রহরী
- শিক্ষার্থীদের ক্যারিয়ার গঠনে ইনটেনসিভ কেয়ার এবং কাউন্সেলিং
- ২৪x৭ বিদ্যুৎ (নিজস্ব ৫০০ কেভিএ সাব-স্টেশন এবং জেনারেটর)
- বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শিক্ষার্থীদের আবাসিক সুবিধা

01329-728375-78 info@iiustb.ac.bd /iiustb

স্থায়ী ক্যাম্পাস: বাইপাইল, আশুলিয়া, ঢাকা-১৩৪৯। (বাইপাইল বাস স্ট্যান্ড থেকে আধা কি.মি. উত্তরে, ঢাকা-ইপিজেড সংলগ্ন)

প্রফেসর ড. এমএ. বারীর পক্ষে **অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল্লাহ ফারুক** কর্তৃক **আল হাদীস প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং** হাউজ: ৯৮, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা-১১০০, বাংলাদেশ হতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
লাব্বাইকা লা-শারীকা লাকা লাব্বাইক
ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মুলক
লা-শারীকা লাক
হজ্জ বুকিং চলছে...
ব্যবসা নয় সর্বোত্তম সেবা প্রদানের মানসিকতা নিয়ে আপনার কাঙ্খিত স্বপ্ন হজ্ব পালনে আমরা আন্তরিকভাবে আপনার পাশে আছি সবসময়
অভিজ্ঞতা আর হাজীদের ভালোবাসায় আমরা সফলতা ও সুনামের সাথে পথ চলছি অবিরত
আমাদের বৈশিষ্ট্য:
রাসুলের (সা:) শিখানো পদ্ধতিতে সহীহভাবে হজ্ব পালন।
সার্বক্ষণিক দেশবরেণ্য আলেমগণের সান্নিধ্য লাভ এবং হজ্ব, ওমরাহ ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়ের উপর আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব।
হজ্ব ফ্লাইট চালু হওয়ার তিনদিনের মধ্যে হজ্ব ফ্লাইট নিশ্চিতকরণ।
প্রতি বছর অভিজ্ঞ আলেমগণকে হজ্ব গাইড হিসেবে হাজীদের সাথে প্রেরণ ।
হারাম শরীফের সন্নিকটে প্যাকেজ অনুযায়ী ফাইভ স্টার, ফোর স্টার ও থ্রী স্টার হোটেলে থাকার সুব্যবস্থা।
মক্কা ও মদিনার ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থানসমূহ যিয়ারতের সুব্যবস্থা।
হাজীদের চাহিদামত প্যাকেজের সুব্যবস্থা।
খিদমাত, সততা, দক্ষতা ও জবাবদিহিতার এক অনন্য প্রতিষ্ঠান।
স্বত্বাধিকারী
মুহাম্মাদ এহসান উল্লাহ
কামিল (ডাবল), দাওরায়ে হাদীস।
খতীব, পেয়ালাওয়ালা জামে মসজিদ, বংশাল, ঢাকা
০১৭১১-৫৯১৫৭৫
HAS
মেসার্স হলি এয়ার সার্ভিস
MEMBER
ATAB
MEMBER
সরকার অনুমোদিত হজ্ব, ওমরাহ ও ট্রাভেল এজেন্ট, হজ্ব লাইসেন্স নং- ৯৩৮
হেড অফিস: ১/২ পশ্চিম হাজীপাড়া, রামপুরা, ঢাকা। গুলজার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭'ম তলা (লিফেটর ৬) (হাজীপাড়া পেট্রোল পাম্পের বিপরীতে)
বগুড়া অফিস: ফতেহ আলী মসজিদের ২য় তলা বগুড়া মোবা: ০১৭১২-১১৫১১৫
মোবাইল : ০১৭১১-৫৯১৫৭৫, ০১৬৭৪-৬৯৫৯৯৬
www.holyairservice.com
holyairservice@yahoo.com
www.facebook.com/holyairservice